বাসুদেব-চরিত।

অর্থাৎ

(শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর-লীলা)

শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-প্রণীত।

সন ১৩০৫ সাল।

Published by H. Sen Gupta.

[মূল্য ॥৵০ দশআনা।

Printed by SATTYA PALLUN NANDY, at the
Arundhaty Printing Works.
4, Malipara, Baranagar, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

পরলোকগত পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺ কাশীচন্দ্র সেনগুপ্ত
মহাশয়ের উদ্দেশে

পিতঃ! আপনিই আমার স্বর্গ, আপনিই আমার ধর্ম্ম, আপনিই আমার তপ যপ, আপনার তৃপ্তি আমার মোক্ষ ফল। তাই ভগবানের লীলা সম্বন্ধীয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, অন্তরের ভক্তি আর চক্ষের জল দিয়া, আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। আপনার অত্যন্ত সত্য-নিষ্ঠা, প্রভূত ধর্ম্মানুরাগ, আর এ অধম সন্তানের প্রতি অসীম স্নেহ-মমতা স্মরণ করিলে, মনে ভরসা হয় যে, ইহা অপরের নিকট অনাদরের হইলেও আপনার নিকট হইবে না।

আপনার স্নেহের,—
উমেশ

বিজ্ঞাপন।

পূরাণ সমূহের সারমর্ম্ম লইয়া সংক্ষেপে এই বাসুদেব-চরিত লিখিত হইল। স্ত্রীলোকেরাও বুঝিতে পারিবেন বলিয়া, ইহার ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়া থাকিলে, পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

এই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৭টী সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটীও আমার রচিত নহে। সঙ্গীত রচনায় আমার ক্ষমতাও নাই। সঙ্গীত, সাধনার একটী প্রধান উপায়। হৃদয়কে দ্রব করিতে সঙ্গীতের ন্যায় আর কি আছে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কুসঙ্গীতের জন্য এদেশের ভদ্রপরিবারের মধ্যে সাধন-সঙ্গীতের আলোচনাও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

উদ্ধৃত সাতটী সঙ্গীতের মধ্যে চারিটী পরম ভক্ত ভাবুক কবি বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত হইতে এবং অবশিষ্ট তিনটী ভিখারীর মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। গান গুলি আমি যে যে প্রসঙ্গের অন্তর্গত করিয়াছি, রচয়িতারা হয় ত সে প্রসঙ্গ উপলক্ষে রচনা করেন নাই। আমার বিষয় গুলিতে খাটাইবার জন্য, স্থানে স্থানে একএকটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আমি উক্ত সঙ্গীত রচয়িতাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুস্তকে ব্রজ ও বৃন্দাবন লীলার সমস্ত চিত্র দিব, কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য বলিয়া, এবারে ৪ খানির অধিক দিতে সমর্থ হইলাম না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক সংকলন বিষয়ে আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ মজুমদার, এবং বাবু অধর চন্দ্র দে ও বাবু শিব কেদার দাঁ ইঁহারা অনেক বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ এবং উৎসাহ দান করিয়াছেন। আমি ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অপর এই পুস্তকের সমস্ত দোষ ত্রুটি, নিজের স্কন্ধে রাখিয়া আমি আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠসহোদর শ্রীমান হরষিত সেন গুপ্তের প্রতি ইহা প্রকাশের ভারার্পণ করিলাম।

বরাহনগর।
৫ই এপ্রিল
১৮৯৮ সাল।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সূচীপত্র।

ব্রজ-লীলা

বৃন্দাবন-লীলা।

মথুরা-লীলা।

দ্বারকা-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও নন্দোৎসব।

স্বেচ্ছাচারী পাপাত্মা দুর্ব্বৃত্ত কংস মথুরার রাজা। তাঁহার রাজ্য-কামুকতা এতদূর প্রবল যে, পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আর, রাজত্ব ভোগের ভবিষ্যৎ অন্তরায় স্বরূপ ভাবিয়া, ভগিনী দৈবকী ও ভগিনীপতি বসুদেবকে প্রহরী-পরিবেষ্টিত কারাগারে বন্দীর অবস্থায় রাখিয়াছেন। অপরাধ,—দৈববাণীতে শুনিয়াছেন, দৈবকীর অষ্টম গর্ভ-জাত সন্তানের হস্তে তিনি বিনষ্ট হইবেন।

রাজা কংস ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের প্রতিবিধান মানসে ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারাগারে রাখিয়া প্রহরীদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন, দৈবকীর গর্ভাবস্থা দেখিলে, তাঁহাকে সংবাদ দিতে হইবে এবং প্রসব করিলেই সদ্য-জাত সন্তানকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইতে লাগিল। পাছে, গর্ভ গণনার ভুলে প্রকৃত শত্রু বিনষ্ট না হয়, এজন্য দৈবকীর প্রথম প্রসব হইতে প্রত্যেক বারের সদ্য-জাত শিশু-কেই রাজা প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দৈবকীর ছয়টী শিশু বিনষ্ট হইল; তাঁহার কেবল গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করাই সার। পতি ও পত্নীর মানসিক ক্লেশের সীমা রহিল না। তাঁহাদের সর্ব্বদাই বিষন্ন বদন, সর্ব্বদাই চক্ষে জল। পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া তাঁহারা কাতর প্রাণে, এক মনে, কেবল বিপদহারী মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী, স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীর সহিত কারাগারে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কিছু দিন পরে, দৈবকীরও পুনরায় গর্ভের সঞ্চার হইল। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভূ-ভার হরণ করিবার জন্য, প্রথমে বিষ্ণু রোহিণী গর্ভে ও মহাবিষ্ণু দৈবকী গর্ভে আবির্ভূত হন; পরে দৈবকীকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, যোগমায়া প্রভাবে, তাঁহারা সংগোপনে গর্ভ পরিবর্ত্তন করেন। যত দিন যাইতেছে, দৈবকীর ততই ভাবনা বাড়িতেছে। প্রসব হইবা মাত্র পাপাত্মা কংস প্রাণের ধন কাড়িয়া লইয়া বিনাশ করিবে, তাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, বিষাদের কালিমায় মুখ ছাইয়া ফেলিয়াছে। পিতা মাতার প্রাণে আর কত সয়?

বসুদেব দেখিলেন, দুরাচার কংসের হস্ত হইতে দৈবকীর গর্ভ-জাত সন্তান রক্ষার কোন উপায় নাই; রোহিণী প্রসব করিলে পাছে সে সন্তানকেও কংস বিনাশ করে, এই ভয়ে রোহিণীকে স্থানান্তরে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন।

মথুরা যমুনা নদীর যে পারে অবস্থিত, তাহার অপর পারে

ব্রজধাম গোকুল। গোকুল, গোপপল্লী। নন্দঘোষ,* গোপ কুলের রাজা। যশোদা রাজা নন্দের মহিষী। বসুদেবের সহিত নন্দের বড় সখ্য ছিল। বসুদেব ভাবিয়া চিন্তিয়া, নন্দালয়ে গর্ভবতী রোহিণীকে পাঠাইলেন; নন্দ এবং যশোদাও তাঁহাকে পরম যত্নে রাখিলেন। তথায় রোহিণী, যথা কালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। কুমারের রূপ-লাবণ্যে গোকুলবাসী মোহিত হইল। রোহিণী-নন্দন নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; নাম হইল বলরাম।

এদিকে কংসের কারাগারে থাকিয়া দৈবকী পূর্ণ-গর্ভবতী হইলেন। আজ ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, অষ্টমী তিথি; সমস্ত দিন অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে ঝড় বৃষ্টি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভগবানের মায়ায় মথুরাবাসী নর-নারী অচেতন হইয়া ঘুমাইতেছে; কারাগারে কংসের প্রহরীগণও ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; কেবল বসুদেব ও দৈবকীর চক্ষে নিদ্রা নাই। দৈবকীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, অর্দ্ধ নিশা গত, ঝড় বৃষ্টি কমিয়াছে, কিন্তু লোকের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। এমন সময়ে দৈবকী একটী পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন। কুমারের নবজলধর শ্যামবর্ণ হইতে নীলকান্ত মণির ন্যায় জ্যোতি বাহির হইয়া, ঘর আলোকিত করিল। দৈবকী পুত্রের রূপ

---

* বসুদেবের পিতার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার ঔরসে, এক বৈশ্যকন্যার গর্ভে, নন্দের জন্ম হয়। সুতরাং নন্দ-ঘোষ যদুবংশসম্ভূত এবং সম্পর্কে বসুদেবের ভ্রাতা। তিনি বয়সে বসুদেব অপেক্ষা বড় ছিলেন।

দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন, তেমন সুলক্ষণ, তেমন সুন্দরাকৃতি, মানুষের ছেলের হয় না। দৈবকী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে আনন্দ হইল না। পাপিষ্ঠ কংসের কার্য্য মনে পড়িল; ভাবিলেন, এই অমূল্য নিধি এখনই কংস কাড়িয়া লইয়া নষ্ট করিবে। পুত্র প্রসব করিলে মাতার আনন্দের অবধি থাকে না, মাতা প্রসবের সমস্ত ক্লেশ পুত্র-মুখ দর্শনে ভুলিয়া যান; কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সুন্দরাকৃতি পুত্র দেখিয়াও দৈবকী কান্দিতে লাগিলেন। দৈবকীর ক্রন্দন শুনিয়া বসুদেব তাঁহার নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রসূত হইয়াছেন, সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত পরম সুন্দর নবকুমার, হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছে, আর তিনি অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কাঁদিতেছেন। দেখিয়া, বসুদেবেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

মাতা পিতাকে শোক-কাতর দেখিয়া, ভগবানের মনে দয়া হইল। তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ছেলে ত সামান্য ছেলে নয়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু! অমনি, প্রেমে ও পুলকে তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহারা চিত্রার্পিতপ্রায় থাকিয়া, অনিমেষ নয়নে পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, পতিত-পাবন হরি পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তখন বাৎসল্য ভাব বিগত হইল, ভক্তি ভাবে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

স্তবে তুষ্ট হইয়া, ভগবান বসুদেবকে কহিলেন, আপনাদের

দুঃখ আমি শীঘ্রই দূর করিব। এখন আমি যাহা বলি, তদনুসারে কার্য্য করুন। আজ, ব্রজে নন্দরাণীর এক কন্যা জন্মিয়াছে। আমাকে শীঘ্র নন্দালয়ে লইয়া গিয়া, নন্দরাণীর ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক, সেই কন্যা আনিয়া, মাতা দৈবকীর ক্রোড়ে অর্পণ করুন। আমার মায়ায় নন্দালয়েও সকলে নিদ্রিত আছে। অতএব এই ব্যাপার কেহ জানিতে পারিবে না, আর এই বিনিময় কার্য্যে কোন অসুবিধাও হইবে না। সাধারণে আমার বালক মূর্ত্তিই দর্শন করিবে। এই বলিয়া ভগবান পুনরায় বালকরূপে অবস্থিত হইলেন। বসুদেব শীঘ্র নন্দালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দৈবকী পুত্রকে বসুদেবের ক্রোড়ে দেওয়ার পূর্ব্বে একবার প্রাণ ভরিয়া তাহার রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

সেই মেঘাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারময় গভীর রাত্রিতেই বসুদেব পুত্র কোলে লইয়া ব্রজে চলিলেন। দ্বিতীয় সহায় নাই, পথে জনমানব নাই, ভগবানের উপদেশে চলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার মনে কোন ভয়ও নাই। কিন্তু ব্যাপারটী এখন তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং পুত্র যে স্বয়ং বিষ্ণু, সে বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। কি প্রকারে যমুনা পার হইবেন, এখন সেই ভাবনায় পড়িলেন। অতি কাতর হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নাম জপ করিতে লাগিলেন; মহামায়ার কৃপায়, কার্য্য সহজ হইল। দেখিলেন, একটী শৃগাল যমুনার এপার হইতে হাটিয়া পর পারে গেল। তাহা দেখিয়া বসুদেবও হাটিয়া যমুনা পার হইতে লাগিলেন।

নানাপ্রকার কাল্পনিক সুখের চিন্তা করিতে করিতে একটু অন্য-মনস্ক হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্রোড় হইতে স্খলিত হইয়া পুত্রটী মধ্য যমুনায় পতিত হইল, বসুদেবের সুখের চমক্ ভাঙ্গিল, ভয়-ব্যাকুল-চিত্তে জল হাতড়াইতে লাগিলেন, ভগবান ধরা দিলেন, বসুদেব এবার সাবধানে পুত্রকে কোলে লইয়া যমুনা পার হইলেন।

তিনি যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্রমে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। পুর-দ্বার বন্ধ ছিল, ভগবানের মায়ায় আঘাত করিবামাত্র উন্মুক্ত হইল। দেখেন, লোকজন সকলেই অসাড়ে ঘুমাইতেছে, সূতিকা গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে, পরিচারিকাগণ নিদ্রিত, নন্দরাণীও নিদ্রিত, কেবল সদ্যপ্রসূত একটী বালিকা, রূপে ঘর আলো করিয়া হাত পা নাড়িয়া ক্রীড়া করিতেছে। বসুদেব নন্দরাণীর পার্শ্বে পুত্র রাখিয়া কন্যা লইয়া ফিরিলেন। মথুরায় কারাগারে উপস্থিত হইয়া দৈবকীর কোলে কন্যা দিলেন। বালিকার ক্রন্দন শব্দে প্রহরীদের ঘুম ভাঙ্গিল; জাগিয়া দেখে, দৈবকী এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই কন্যা লইয়া রাজা কংসের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি পাষাণে আঘাত করিয়া বধ করিবার জন্য, বালিকাকে যেমন উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি, বালিকা হস্তস্খলিত হইয়া অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গগণ মণ্ডলে অন্তর্হিত হইলেন। অন্তর্ধানের সময় বলিয়া গেলেন, রে পাপিষ্ঠ! অবিলম্বে তুই এই পাপের সমুচিত ফল পাইবি, তোর বিনাশ-কর্ত্তা নন্দালয়ে পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপারে কংসের মনে অতিশয় ভয় ও বিস্ময় জন্মিল। রজনী প্রভাত হইলে, তিনি সমস্ত ঘটনা মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, এবং দৈববাণীতে নন্দগৃহে শত্রু জন্মিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তাহার বিনাশের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রজপুরীতে বালকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া নন্দ-রাণীর ঘুম ভাঙ্গিল। সূতিকাগৃহের পরিচারিকাগণও জাগ্রত হইল এবং রাণীর পার্শ্বে সুন্দর বালক দেখিয়া সকলে মহা আনন্দিত হইল। নন্দরাণী, এক ভুবন-মোহন পুত্র প্রসব করিয়াছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সুসমাচার পুরীময় প্রচারিত হইল। পুরবাসীরা আসিয়া দেখিল, সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত পরম সুন্দর পুত্রের রূপে সূতিকাগৃহ আলোকিত হইয়াছে। আনন্দের আর সীমা রহিল না। রজনী প্রভাত হইবামাত্র ব্রজবাসী নর-নারী নন্দের নবজাত কুমারকে দেখিবার জন্য, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সমভিব্যাহারে, নন্দরাজের গৃহে সমাগত হইতে লাগিল। নন্দরাজ সমস্ত ব্রজবাসীর সহিত আনন্দোৎসবে মত্ত হইলেন। নৃত্যগীত প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের ধূম পড়িয়া গেল। ব্রজধাম, আনন্দ ধাম হইয়া উঠিল।

পূতনা ও শকট বধ।

রাজা কংস মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, বল প্রকাশ অপেক্ষা কৌশলে শত্রু বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। নন্দ-

নন্দনের বয়স যখন একমাসও হয়নাই, তখন তিনি পূতনা নামক এক মায়াবিনীকে অভীষ্ট সাধনজন্য নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন। পূতনা মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া, নন্দরাজের পুরীতে উপস্থিত হইল, যশোদার কোলে নীলমণিকে দেখিয়া সুন্দর বালকের প্রতি কত স্নেহ দেখাইতে লাগিল, এবং আদর করিবার ছলে তাঁহাকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া, স্বীয় বিষমাখা স্তন বালকের মুখে দিল, অন্তর্যামী ভগবান্ পূতনার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার নামে বিষের যন্ত্রণা যায়, বিষপানে তাঁহার আর কি হইবে? তিনি স্তন মুখে লইয়া পুতনার রক্তশোষণ আরম্ভ করিলেন। পূতনা যন্ত্রণায় অস্থির হইল এবং বালকের মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। ভগবান ছাড়িলেন না, সে বিকট ধ্বনি করিয়া বিকৃত মূর্ত্তিতে ভূতল-শায়িনী হইল, তাহার মায়ার কুহক ভাঙ্গিল, জীবন অন্ত হইল। পূতনার বিকট শব্দ শ্রবণে যশোদা চকিৎ হইয়া পূতনার দিকে চাহিলেন, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি নীলমণিকে কোলে লইলেন। ঘটনা দেখিয়া ব্রজের সকলে অবাক্ হইয়া রহিল।

রাজা কংস পূতনা বধের সমাচার পাইয়া অধিকতর ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাহার পরেই শকট নামক এক বীরকে শত্রু বিনাশের জন্য প্রেরণ করিলেন। বালকরূপী ভগবানের নিকট শকটের বলবীর্য্যও খাটিল না, তাঁহার পদাঘাতে শকট দৈত্যও নিধন প্রাপ্ত হইল। বালকের কার্য্য দেখিয়া কংসের ভয় ও ব্রজবাসীদিগের বিস্ময়, ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।



নামকরণ।

নামকরণ।

নন্দ-নন্দন শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বালকের নামকরণ জন্য, রাজপুরোহিত গর্গ-মুনি যথা সময়ে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি বালকের অবয়বে দিব্য লক্ষণ সকল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ধ্যানযোগে জানিলেন, সৃষ্টির কণ্টকস্বরূপ স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত নর-দৈত্য দিগকে নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে এবং সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতে ভগবান নারায়ণ, লীলাময়ী প্রাকৃতিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহর্ষি গর্গ বালকের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া, প্রেমানন্দ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কি নাম রাখি ? বেদে ইঁহাকে সনাতন ব্রহ্ম বলে; কিন্তু এ বিশাল নাম সকলে হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম, তবে কি নাম রাখি ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কলুষ-নাশক " কৃষ্ণ " নাম রাখাই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন এবং ভাবে গদ গদ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, দয়াময়! তুমি এই নিখিল বিশ্বের কারণ এবং ভক্তের জীবনধন। তুমি অনাদি পুরুষ, তোমার আবার কোন্‌কালে পিতাছিল যে, শিশুকালে নাম রাখিবে ? তুমি সকলের পিতা, তোমার কোলেই সকলে পালিত, তুমি চিরকাল ভক্তের অধীন। ভক্তই তোমার জন্ম-দাতা, ভক্তই তোমার পিতা। ভক্ত, ভক্তি ভরে যখন যে নাম রাখিয়াছে, সেই নামেই তোমার নাম হইয়াছে ; তাই আজ আমি, তোমার কৃষ্ণ নাম রাখিয়া চরিতার্থ হইলাম।

গর্গ, নন্দ-নন্দনের কৃষ্ণ নাম রাখিলেন, ব্রজবাসী নর-নারী নাম শুনিয়া পুলকিত হইল। কিন্তু ভুবন মোহন বালকের মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া ব্রজের গোপ গোপীরা প্রায় সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের নূতন নূতন আদরের নাম রাখিলেন। আদর করিয়া নন্দ ও যশোদা গোবিন্দ, গোপাল, নীলমণি প্রভৃতি নামে সদাসর্ব্বদা ডাকিতেন; রাখালেরা কানাই নামে ডাকিত; গোপবালারা শ্যামসুন্দর, মদন-মোহন, বংশীবদন, বনমালী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন।

কর্ণ মুনির নন্দালয়ে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভক্ষণ।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের চপলতাও তত বাড়িতে লাগিল। হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন, ক্রমে হাঁটিতে শিখিলেন; কাহাকেও ভয় নাই, কাহারও তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ নাই। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই এক সঙ্গে খেলা করেন, তাঁহাদের ক্রীড়া কৌতুক দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতে লাগিল। বলরাম অপেক্ষা কৃষ্ণ অধিক চঞ্চল, তাঁহার রঙ্গ তামাসাও বেশী, ব্রজের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে, সকলেই তাঁহাকে আদর করে। ক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র বড় আব্দারে হইয়া উঠিলেন। প্রতিবেশী গোপনারীদিগের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যান। কাহারও কোলে

উঠিয়া কাঁচুলি ছেঁড়েন, কাহারও ঘরে ঢুকিয়া দধির পাত্র ভাঙ্গেন, দুধ ঢালেন, ননী খান, এই রূপ বহুবিধ উপদ্রব করেন। গোপাঙ্গনারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কৃত্রিম তাড়না করেন, কিন্তু বিরক্ত হন না, বরং ক্রীড়া-রঙ্গ দেখিবার অভিলাষে অধিক উত্তেজিত করেন, আর হাসেন।

একদিন কর্ণমুনি নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া নন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কর্ণের নিদেশ ক্রমে যশোদা পায়সান্নের আয়োজন করিলে, কর্ণ অন্ন প্রস্তুত পূর্ব্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া, আহারে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ খেলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। যশোদা ছেলেকে ভৎর্সনা করিতে করিতে টানিয়া লইলেন এবং কাতর ভাবে মুনির নিকট ক্ষমা চাহিয়া পায়সান্নের পুনরায় আয়োজনের অনুমতি লইলেন। শীঘ্র আয়োজন হইল, কর্ণ পুনরায় অন্ন প্রস্তুত করিলেন। যশোদা এবার ছেলেকে এক ঘরে পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কর্ণমুনি ভোজনে বসিয়া শ্রীহরির উদ্দেশে ভক্তি পূর্ব্বক অন্ন উৎসর্গ করিতেছেন, কৃষ্ণ এবারেও ছুটিয়া আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণমুনি অবাক্ হইয়া কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যশোদা ভৎর্সনা করিতে করিতে ধাইয়া আসিয়া পুত্রকে প্রহারে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও কিরূপে বাহির হইয়া আসিলেন, ভাবিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কর্ণ ব্যাপার অবগত হইবার জন্য ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন, যে হরির উদ্দেশে তিনি অন্ন উৎসর্গ করিতেছিলেন,

নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সেই হরিরই অবতার। পৃথিবীর মঙ্গল সাধন জন্য, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দালয়ে পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন। কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কর্ণ চরিতার্থ হইলেন এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ;—

ভকত বৎসল হরি বিপদ হরণ,
পুরাণ পুরুষোত্তম লক্ষ্মীকান্ত সনাতন।
বরণ জলদ ঘটা হৃদয়ে কৌস্তভ ছটা,
বনমালা আভরণ, দেহ মোরে শ্রীচরণ।
নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে,
সনকাদি ঋষিগণ, করিতেছে বন্দন।
ডাকি তোমা দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,
কৃপা কর গদাধর, অন্তে দিও শ্রীচরণ।

কর্ণ যশোমতীর নিকট প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া বলিলেন, রাণি! ক্ষান্ত হও, তুমি বড় ভাগ্যবতী, তোমার ছেলের লক্ষণ বড় ভাল, ও ছেলের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে দোষ নাই, এই বলিয়া মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অকল্যাণ হইল ভাবিয়া নন্দরাণী, গলবস্ত্র হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত মুনির নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। কর্ণ যশোদাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, তুমি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাবিও না, তোমার ছেলের কোন অমঙ্গল হইবে না। আজ তোমার আলয়ে



উদুখলে বন্ধন ।

পায়সান্ন আহার করিয়া আমি যে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম, তেমন তৃপ্তি ও আনন্দ, আমার জন্মেও আর কখন ঘটে নাই এই বলিয়া কর্ণমুনি বিদায় হইলেন।

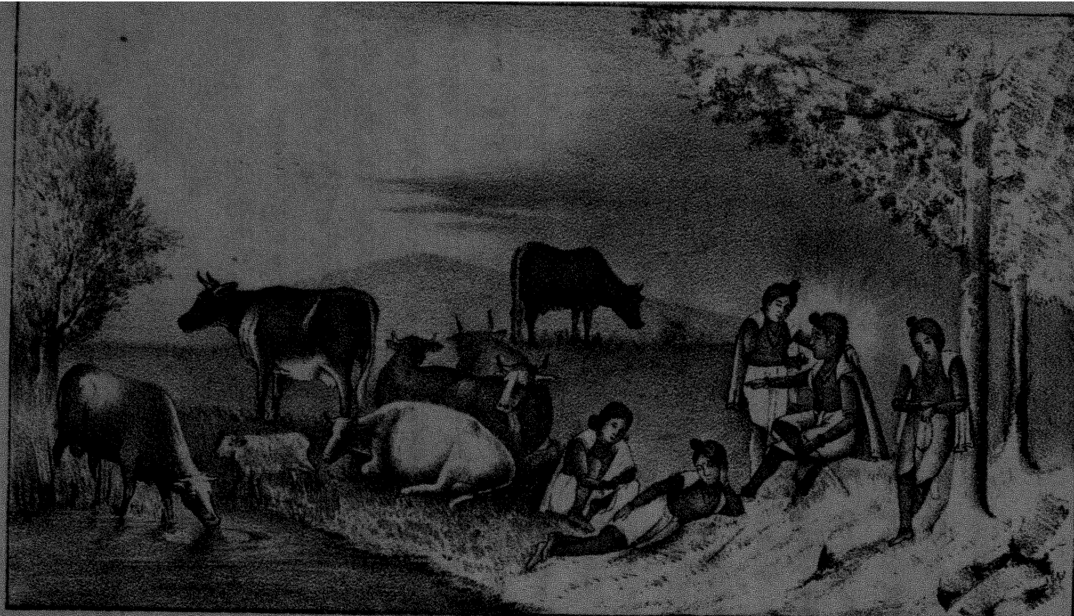
উদুখলে বন্ধন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবেশী এক গোপীর গৃহে ঢুকিয়া ভাণ্ড হইতে ননী খাইয়াছেন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ফেলিয়াছেন, অশেষ উৎপাত করিয়াছেন। কৃষ্ণের দৌরাত্ম্যের কথা, ঐ গোপী যশোদাকে জানাইল। যশোদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, পুত্রকে প্রহার করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ কাতর হইয়া বলিলেন, মা! আর করিব না। কৃষ্ণের কাতরতা দর্শনে, অন্য গোপীগণও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ক্ষান্ত হওয়ার জন্য, ব্যগ্রতার সহিত যশোমতীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যশোদা কাহারও কথা শুনিলেন না; কৃষ্ণকে দড়ি দিয়া উদুখলের সহিত দৃঢ় রূপে বান্ধিয়া গৃহকার্য্যে গমন করিলেন।

ব্রজবাসিদিগকে স্বীয় মাহাত্ম্যের কিছু পরিচয় দিতে বুঝি ভগবানের ইচ্ছা হইল। তিনি প্রকাণ্ড উদুখলকে সবলে আকর্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, উহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথে যমলার্জ্জুন নামক অতি বিশাল বৃক্ষের মধ্যে উদুখল বাধিয়া শ্রীকৃষ্ণের গতি রোধ হইল, তিনি থামিলেন না; সমধিক বলে আকর্ষণ-করায়, গাছ দুইটী ভূপতিত হইল। ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ-

দ্বয়ের পতনশব্দে নিকটস্থ গোপ গোপীগণ চমকিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল, প্রকাণ্ড যমলার্জ্জুন বৃক্ষ পতিত হইয়াছে, উদুখলেবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ, ভূতলশায়ী বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ক্রীড়ার ভাবে হাস্য করিতেছেন। তাহারা উৎকণ্ঠিতচিত্তে দ্রুতবেগে গিয়া, যশোমতীর নিকট সংবাদ দিল। যশোদা বিপদের আশঙ্কা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আলুলায়িত কেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় দৌড়িয়া আসিলেন। তাড়াতাড়ি বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া গোপালকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন বাছা! গায়ে আঘাত লাগে নাই ত? তুমি এখানে কেন? গাছ পড়িল কি রূপে? গোপাল বলিলেন, মা! খেলিতে আসিয়াছি,বহু দিনের পুরাতন গাছ উদুখলে আটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে; আমার শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই। শুনিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

ব্রজে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হইল দেখিয়া, ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস করিতে নন্দরাজের ইচ্ছা হইল। তিনি ব্রজের সমস্ত গোপকে একত্রিত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, বৃন্দাবন নিকুঞ্জপরিবেষ্টিত অতি মনোহর স্থান। তথায় চির-বসন্ত বিরাজিত, কোকিলাদি বিহঙ্গগণ সর্ব্বদা মধুর ধ্বনি করে, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে, মৃগকুল আনন্দে বিচরণ করে। তথাকার উদ্যানসকল বিবিধ বর্ণের কুসুমে পরিশোভিত। তথায় পুষ্প-পরিমলবাহী সুগন্ধ সমীরণ সতত সঞ্চরণ করে, পবিত্র সলিলা যমুনা প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত, প্রান্তরসকল নিরন্তর শ্যামল তৃণে



গোচারণ।

পরিবৃত থাকায় গোচারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বৃন্দাবনে গেলে শোকার্ত্ত ব্যক্তিরও মনের কষ্ট দূর হয়। চল, আমরা ঐ সুখময় রম্য স্থানে গিয়া বসতি করি। নন্দরাজের বাক্যে গোপগণ সম্মত হইল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সমস্ত গোপগণের সহিত বৃন্দাবনে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

বৃন্দাবন-লীলা

গোচারণ।

নন্দরাজ সমস্ত গোপগণের সহিত বৃন্দাবনে মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলরাম একটু বড় হইয়াছেন, নন্দের কার্য্যোপযোগী হইয়াছেন। নন্দ, গোয়ালার রাজা, ধেনুবৎসই তাঁহার প্রধান সম্পত্তি। রামকৃষ্ণ কখনও নন্দের দধি দুগ্ধের পশরা বহন করেন, কখন কখন গোচারণের জন্য মাঠে যান। প্রতিবেশী গোপবালকেরা, দল বান্ধিয়া প্রতিদিন প্রভাত কালে গরু চরাইতে গোষ্ঠে যায়; রামকৃষ্ণও তাহাদের সঙ্গে ধেনুবৎস লইয়া গমন করেন। গোলোক বিহারী হরি, ভক্তের কার্য্যে ও পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতে, আজ বৃন্দাবনে রাখাল!

রাখাল বালকেরা সজ্জিত হইয়া গোষ্ঠে যায়; যশোদা এবং রোহিণীও কৃষ্ণ বলরামকে সাজাইয়া দেন। চাচরকেশ বিনাইয়া মস্তকের সম্মুখে চূড়া বান্ধেন, গায়ে পীত ধড়া আঁটেন। পায়ে নূপুর পরান, অলকা তিলকায় মুখমণ্ডল সজ্জিত করেন, হাতে

পাচনবাড়ি দেন। এইরূপ মোহনবেশে সাজিয়া, রাম কৃষ্ণ রাখাল বালকদিগের সঙ্গে গোচারণে যান। গোষ্ঠে গিয়া মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া সকল রাখাল মিলে, গাছতলায় ক্রীড়া-কৌতুক করেন। কৃষ্ণের মোহনরূপে ও মধুর ভাবে তাঁহার প্রতি সকল রাখালই বেশী অনুরক্ত, সকলেই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত খেলার অনুষ্ঠান করে। কৃষ্ণও মধুর সখ্যভাবে সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার করেন। রাখালেরা বনফুল তুলে, মালা গাঁথে, কৃষ্ণের গলায় পরায়; বনফল আনিয়া কৃষ্ণকে খাওয়ায়, আপনারা খায়; কখনও কৃষ্ণ ফল খাইতেছেন, রাখালেরা কাড়িয়া খায়, কখনও রাখালদের মুখের ফল, কৃষ্ণ কাড়িয়া লন্; কখনও কৃষ্ণকে রাজা করে, আপনারা প্রজা সাজে, কখনও কৃষ্ণকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করে, কখনও বা তাঁহার স্কন্ধে চড়ে। কখনও কৃষ্ণ বাঁশী বাজান, রাখালেরা গান গায়। সকলের প্রতি সমভাব, কে ছোট, কে বড়, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাখাল সখাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ, ধেনুবৎস লইয়া গৃহে প্রতিগমন করেন।

শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, সুবাহু, মহাবল, সুবল, অর্জ্জুন, লবঙ্গস্য, বাৎস্বল্য প্রভৃতি রাখাল বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের সখা। কৃষ্ণ ভিন্ন গোষ্ঠ-ক্রীড়ায় আমোদ হয় না, তাই তাহারা প্রত্যুষেই গোচারণে যাইবার জন্য, নন্দালয়ে গিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকে, কৃষ্ণও যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হন। যশোদা ইহা ভাল বাসেন না। চঞ্চল-স্বভাব কৃষ্ণ, কোন্ দিন কোন্ বিপদ্ ঘটাইবেন, তাঁহার মনে সদাসর্ব্বদা সেই ভয়। বিপদ-

ভঞ্জন মধুসূদনের আবার বিপদ কি, চক্রপাণি মাতাকে সে কথা বুঝিতে দেন নাই। মাতা সহজে নীলমণিকে গোষ্ঠে পাঠাইতে রাজি হন না। রাখাল বালকদিগকে নিষেধ করিয়া বলেন, না,—আমার গোপাল আজ গোষ্ঠে যাবে না, তোমরা যাও। প্রাণের ভালবাসার টান, তাহারা কি সে কথা শোনে? আশে পাশে থাকিয়া উঁকি ঝুঁকি মারে, সঙ্কেত করে, গোপাল যাওয়ার জন্য চট্ ফট্ করেন, মাতার পায়ে ধরেন, বিনয় করেন। যশোদা অগত্যা বলাইয়ের প্রতি সাবধানতার ভার দিয়া যাইতে অনুমতি দেন। যশোদার মন, সারাদিন গোষ্ঠের দিকেই থাকে। বেলাবসানে পথের দিকে চাহিয়া নীলমণির আগমন প্রতীক্ষা করেন। রাম কৃষ্ণ আসিলে, তাঁহাদের মুখ চুম্বন করিয়া, গায়ের ধূলা বালি ঝাড়িয়া দেন, ক্ষীর ননী খাওয়ান। নীলমণি মহা আনন্দে মাতার নিকট গোষ্ঠক্রীড়া বর্ণন করেন; আপনি হাসেন, মাকে হাসান। এই রূপে প্রতিদিনের গোচারণ সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোধন হরণ।

এক দিন কৃষ্ণ সহচরগণসহ গোচারণে প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে নারদ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ঠাকুরের কার্য্য দেখুন, বৃন্দাবনে রাখাল বেশে রাখাল বালকগণের সঙ্গে গোরু চরাইতেছেন। ব্রহ্মা চমৎকৃত হইলেন; ভগবান গোরু চরাইতেছেন, কথাটায় বিশ্বাস হইল না। পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ক্রীড়ামত্ত রাখাল

বালকগণের সহিত গোধন হরণ পূর্ব্বক সকলকে অচেতনাবস্থায় গিরিগুহায় অবরুদ্ধ রাখিলেন। বেলা অবসানপ্রায়, গৃহ গমনের সময় উপস্থিত, কিন্তু কৃষ্ণ, রাখাল-সখাদিগকে বা গাভীদিগকে দেখিতে না পাইয়া চঞ্চল হইলেন। অন্তর্যামী ভগবান, ব্যাপারটী বুঝিলেন। তিনি অবরুদ্ধ রাখাল বা গাভীদিগকে উদ্ধার না করিয়া, ভগবৎ মায়ায় তাহাদের অনুরূপ সখা ও গাভী সৃষ্টি পূর্ব্বক, সেই গাভী ও সেই রাখালদের সঙ্গে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

গোষ্ঠবিহার পূর্ব্ব মতই চলিতে লাগিল। একবৎসর এই ভাবে যায়, এক দিন ব্রহ্মার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইল। তখন তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, অবরুদ্ধ গাভী ও রাখালগণ অচেতনাবস্থায় পূর্ব্ববৎ গিরিগুহায় রহিয়াছে; তাহাদের অনুরূপ গাভী ও রাখাল লইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠবিহার করিতেছেন। তখন নারদ-বাক্যে ব্রহ্মার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি রাখালদিগকে ও গাভীদিগকে সচেতন করিয়া, তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বহু স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে ক্ষমা করিলেন। রাখালেরা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ভাবিল, ক্রীড়াক্লান্ত-দেহে নিদ্রা গিয়াছিল, নিদ্রা হইতে এখন উত্থিত হইল। ভগবান নূতন গাভী ও রাখাল-দিগকে যোগ প্রভাবে অন্তর্হিত করিলেন। ঈশ্বরত্ব জ্ঞান, সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে। ভগবানকে চিনিতে ব্রহ্মারই ভ্রম হইল, সামান্য মানব—আমরা কোন্ ছার।

কালীয় দমন।

একদা শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সখাদিগের সঙ্গে যমুনা তটে ভ্রমণ করিতে করিতে, তাল-তমাল-পরিবেষ্টিত এক অতি মনোহর হ্রদ দেখিতে পাইলেন। হ্রদের জলে ক্রীড়ার অভিলাষে বনমালী সহচরদিগকে দূরে রাখিয়া, উহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তটস্থ এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক জলে ঝম্প প্রদান করিয়া পড়িলেন। ঐ হ্রদে ভীষণ কালীয় নাগের বাস। তাহার ভয়ে ঐ মনোহর সরোবরের তটে বা জলে কোন প্রাণীই গমন করিত না। বিশ্বম্ভরের পতনে জল আলোড়িত হইল। তিনি সলিল-শায়ী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকে জলমধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, ভীষণ-মূর্ত্তি দুর্জ্জয় কালীয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। সে বিশাল ফণা বিস্তার পূর্ব্বক সহচর সর্পগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে তীর বেগে ধাবিত হইল এবং নিকটে আসিয়া সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। মধুসূদন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অকাতরে সলিলোপরি ভাসিতে লাগিলেন। সহচর রাখালগণ দূর হইতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে চীৎকার আরম্ভ করিল এবং কান্দিতে কান্দিতে নন্দালয়াভিমুখে ধাবিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে বৃন্দাবনময় এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নন্দ, যশোদা এবং বৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া হ্রদের নিকটে আসিলেন। দেখেন, গোপাল নাগপাশে বেষ্টিত হইয়া সলিলোপরি

অচেতনবৎ ভাসিতেছেন। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। কেবল বলাই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছেন। ভাই কানাইয়ের মর্ম্ম বলাই জানেন, তাই বলাইয়ের মন প্রথমে টলে নাই। শেষে সকলকে পাগলের মত কান্দিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ নন্দ ও যশোদার আর্ত্তনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, বলরামও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রাতাকে সঙ্কেত পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য প্রকাশের উপযুক্ত সময় হইয়াছে, জানাইলেন।

বলরামের সঙ্কেত অনুসারে মধুসূদন মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিলেন; সর্পগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দূরে ছট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। কালীয়ও ভগ্নদেহ হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। নন্দ-দুলাল তাহাকে ছাড়িলেন না। তাহার বিশাল ফণার উপর চড়িয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিশ্বম্ভরের বিষম ভার সহ্য করিতে না পারিয়া কালীয় রক্ত বমন আরম্ভ করিল। তখন সে ম্রিয়মাণ হইয়া কাতরতা জানাইলে, দয়াময় দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে বাস করিবার অনুমতি করিলেন। ভগবানের আদেশে কালীয় সহচরগণের সহিত তখনই সমুদ্রাভিমুখে গমন আরম্ভ করিল।

এই রূপে দুর্জ্জয় কালীয়কে দমন পূর্ব্বক নন্দ-দুলাল তীরে উত্তীর্ণ হইলে, নন্দ ও যশোদা হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত গোপগোপী বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বালকের শক্তি ও সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে নীলমণিকে লইয়া মহানন্দে প্রস্থান করিল। প্রমত্ত কালীয়নাগ বিতাড়িত হওয়ায়, সেই মনোহর হ্রদ নিরাপদ

স্থান হইল। বৃন্দাবনবাসীদিগের একটী মহা আশঙ্কার কারণ ঘুচিল।

কংস-প্রেরিত দৈত্যসমূহ।

কংস শত্রু বিনাশের জন্য ব্রজধামে পুতনাকে ও শকট দৈত্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা বিনষ্ট হইলেও তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। নন্দরাজ অনিষ্টের আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে বসতি করিলেন। কংস কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য সেখানেও তৃণাবর্ত্ত, বক, ধেনুক, অঘাসুর, প্রলম্ব, শঙ্খচূড়, বৃষ প্রভৃতি দৈত্যদিগকে ক্রমে পাঠাইলেন। বাল্যক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সকলকেই বিনাশ করতঃ বৃন্দাবনবাসীদিগকে শত্রু-ভয় শূন্য করিলেন। বৃন্দাবন, সকল বিষয়েই সুখের স্থান হইল।

গোবর্দ্ধন ধারণ।

শ্রীকৃষ্ণ শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গে, মধ্যে মধ্যে যে সকল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, বৃন্দাবনবাসী গোপগোপীরা তাহা দেখিয়া তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া ভাবিত, তিনি বালক হইলেও সকলের ভক্তি ও মন[illegible] আকৃষ্ট হইয়া-

ছিল। সকলে গুরু-বাক্যের ন্যায় তাঁহার উপদেশ পালন করিত। তিনি লোক-হিতার্থ মর্ত্ত্য-লীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যদি তাঁহার আজ্ঞা ও উপদেশ লোকে অবহিত চিত্তে প্রতিপালন না করে, তাহাহইলে তাঁহার এই লীলা বিফল হইয়া যায়, এই জন্যই বোধ হয়, ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন দ্বারা মধ্যে মধ্যে লোকদিগকে মোহিত করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনধারণ ব্যাপারটী তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক।

শরৎকালে একদা গোপগণ আপনাদের চির-প্রথানুসারে দধিদুগ্ধাদি বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক মহা আনন্দে ও উৎসাহে ইন্দ্রদেবের পূজার অনুষ্ঠান করিতেছে; দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই সকল অনুষ্ঠান কিসের? গোপেরা উত্তর করিল, আমরা ইন্দ্র পূজা করিব। দেবরাজ ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন,তাহাতে পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জলাশয়াদি জলপূর্ণ এবং প্রান্তর সকল তৃণপূর্ণ হয়, সুতরাং ইন্দ্রদেব সকল প্রকারে আমাদের কল্যাণ দাতা। তাই, আজ আমরা দেবরাজের পূজার অনুষ্ঠান করিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা ভ্রান্ত। ইন্দ্র অপেক্ষা গিরিগোবর্দ্ধন আমাদের অধিক উপকারী, তাঁহার উপত্যকায় আমরা গোচারণ করিয়া গোধন রক্ষা করি, গোধনই আমাদের সর্ব্বস্ব, অতএব এই গোবর্দ্ধন গিরিই আমাদের পূজনীয়। তোমরা ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া পরম মিত্র গোবর্দ্ধনের পূজা কর।

কৃষ্ণ-বাক্যে গোপগণের মহা ভক্তি; সুতরাং তাহারা তাহাই করিল। গোপগণের আচরণে ইন্দ্রের মহা কোপ জন্মিল। তিনি

ক্রমান্বয়ে সাতদিন মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক বৃন্দাবনকে প্লাবিত করিয়া তুলিলেন। বৃন্দাবনবাসিগণ, ধেনুবৎস সহিত বিনষ্টহইবার উপক্রম হইলে, ভীত মনে কেশবকে বলিল, কেশব! তোমার কথা শুনিয়া আমরা ইন্দ্রকোপে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছি। এখন উপায়? কৃষ্ণ বলিলেন,—ভয় নাই, গিরি গোবৰ্দ্ধনই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া বিশ্বম্ভর গোবৰ্দ্ধন গিরিকে উৎপাটন পূর্ব্বক বাম হস্তে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রহিলেন। বৃন্দাবনবাসীদিগকে বলিলেন, তোমরা ধেনু বৎস সহিত এই পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থান কর। তাহারা তাহাই করিল। ইন্দ্র বুঝিলেন, সমস্তই চক্রপাণির চক্রান্ত। তিনি লজ্জিত হইয়া, ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন,—

জয় মুকুন্দ মাধব নারায়ণ,
কৃপা কর কমল লোচন।
শ্রীনিবাস দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,
কৃপা কর বিশ্বেশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন।
জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর,
হৃষীকেশ গড়ুর বাহন।

স্তবে তুষ্ট হইয়া দয়াময়, ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিল, কৃষ্ণের আদেশে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল। ভগবান, গোবৰ্দ্ধনকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বৃন্দাবনবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য দর্শনে মোহিত হইল।

কৃষ্ণ-প্রেমিকা গোপীগণ।

বৃন্দাবনে গোপী-প্রধান শ্রীরাধা* এবং চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, লবঙ্গলতা প্রভৃতি শ্রীরাধার আটজন সখী পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্য ফলে মহা বৈষ্ণবী। ইঁহারা শ্রীহরির প্রেমাভিলাষিণী হইয়া একাগ্রচিত্তে গাঢ় ভক্তির সহিত ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন, স্তব করেন, ধ্যান করেন; শ্রীহরিই ইঁহাদের একমাত্র অভীষ্ট দেবতা। ইঁহাদের প্রেম ভক্তি অতুলনীয়। মর্ত্ত্যলোক বাসীদিগকে প্রেম ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বুঝি বিধাতা প্রেমানন্দের পুত্তলি স্বরূপ এই ব্রজদেবীদিগকে সৃজন করিয়াছেন।†

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরিভক্তি পরায়ণা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিলেন্ যে, তিনিই গোলক-বিহারী শ্রীহরির অবতার। গোপবালারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান জানিয়া

---

* শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মাহাভারত প্রভৃতি পুস্তকে রাধা নাম নাই, প্রধানাগোপী শব্দ আছে। টীকাকারেরা বলেন, তিনিই শ্রীরাধা।

† চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে ত্রিবিধ শক্তি আছে। ঐ শক্তিত্রিতয়ের সহিত তাঁহার নিত্য লীলা। বৃন্দাবনের গোপী-প্রধান রাধা, ঐ হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দ শক্তি স্বরূপা। হ্লাদিনী শক্তির রসপোষিকা অষ্টবিধ ভাব আছে। রাধিকার অষ্ট সখী, সেই অষ্ট ভাবের স্বরূপ। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার ইহাই কারণ বলিয়া, কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেম কখনও একপক্ষ আশ্রিত হয় না। ভালবাসিলেই ভালবাসা পাওয়া যায়। যে ভগবানকে ভালবাসে, ভগবানও তাহাকে ভালবাসেন। ভগবানের ভালবাসাকে ভগবৎ-প্রেম, আর ভক্তের ভালবাসাকে ভক্তের প্রেম বলে। ভগবানকে ভালবাসিয়া ও ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী হইয়া ভক্তের যে সুখ, তাহার তুলনা নাই। ভক্ত, সমস্ত পৃথিবীর রাজত্বের সহিত সেই সুখের বিনিময় করিতে চায় না। গোপীগণ সেই স্বর্গীয় সুখের অধিকারিণী হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। তাঁহারা কৃষ্ণকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করেন, কৃষ্ণকে সাজাইয়া সুখী হন। কৃষ্ণের পরিতৃপ্তির জন্য আপনারাও সজ্জিত হন। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। কৃষ্ণ, পিতা মাতার নিকট শিশু, রাখাল সখাদিগের নিকট বালক, শত্রুদমনের সময় প্রবীণ, আর প্রেমিকা গোপবালাদিগের নিকট প্রেমিক-যুবকের ন্যায়, বৃন্দাবনে লীলা করিতে লাগিলেন।

গোপীগণ পতিভাবে জগৎপতির প্রতি প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। পতির প্রতি সতীর প্রেমই পবিত্র-প্রেম. পতি সেবাই সতীনারীর চরম সেবা। সেই পবিত্র প্রেম, সেই চরম সেবা, গোপাঙ্গনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে স্থাপিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

সৃষ্টিব্যাপারে ভগবানের বৈজ্ঞানিক কৌশল, শিল্পচাতুর্য্য ও রসমাধুর্য্য প্রভৃতির যে অল্পাংশই সামান্য মানব-বুদ্ধিতে আমরা

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, তাহাতেই বুঝি, সেই মহা-বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মাণ্ডপতি যেমন চতুর-শিল্পী, তেমনি রসিক চূড়ামণি।

জীবজন্তুর জন্ম ব্যাপার হইতে আরম্ভকরিয়া তাহাদের গঠন-বৈচিত্র, বর্ণ-বৈচিত্র, মানসিক-বৈচিত্র, যে দিকে দৃষ্টি কর, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইবে। অন্য প্রাকৃতিকপদার্থেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার কত কৌশল, কত রসিকতার ভাব বিদ্যমান। ভাবুক ভিন্ন অপরে সে ভাব গ্রহণ করিতে পারেনা। যাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তিনি একটী সামান্য পুষ্প দর্শনেই মোহিত হন। তাহার দল, বর্ণ, গন্ধ, মধু সর্ব্বাঙ্গেই অনন্ত কৌশল, সর্ব্ববিষয়েই রসিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া, তিনি পুলকাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। শুধু শুষ্কজ্ঞানে সৃষ্টির এইরূপ বৈচিত্র হওয়া কি সম্ভব?—কখনই নহে। সেই জন্যই বলিতেছি, ভগবান কেবল চতুর শিল্পী নন,—রসিকেরও চূড়ামণি। তাঁহার রসিকতা যে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র, তাহা বলা বাহুল্য।

রসরাজ শ্যামসুন্দর, গোপবালাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করেন, কখন তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষা করেন, কখন তাঁহা-দিগকে স্বর্গীয় প্রেম দেখান। এই স্বর্গীয় প্রেমলীলা, ভাগ্যহীন অপ্রেমিক ব্যক্তিদিগের অগোচরে, কখনও নিভৃত নিকুঞ্জ-বনে, কখনও যমুনা পুলিনে, নিস্তব্ধ নিশীথ কালে সম্পন্ন হয়।

জল, বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতিকে ভগবান যেমন মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, ধন, মান, জ্ঞান, আনন্দ, সুখ,

শান্তি প্রভৃতিকে তেমন সাধারণ ভোগ্য করেন নাই। উহা তাঁহার বিশেষ দান। কর্ম্ম ও সাধনার পুরস্কারস্বরূপ তিনি মানবকে ঐ সকল প্রদান করেন। তিনি মানুষকে স্বাধীন মনোবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, তদনুশীলন দ্বারা যে, যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে তাঁহার ঐ বিশেষদান লাভে সমর্থ হয়। জানি না, গোপবালাদিগের কি পুণ্য সঞ্চয় ছিল, যাহার বলে তাঁহারা এই অপার্থিব সুখের অধিকারিণী হইলেন।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধিকাদি গোপ যুবতীরা যখন দধি দুগ্ধের পশরা লইয়া বিক্রয়ার্থে গ্রামান্তরে গমন করেন, শ্যামসুন্দর সে সময়ে যমুনা পারের কাণ্ডারী সাজেন। ভবকর্ণধারকে কাণ্ডারী পাইয়া, গোপাঙ্গনারা মহানন্দে নির্ভয় মনে পার হন। একদিন রসিক চূড়ামণি গোপাঙ্গনাদিগকে নৌকায় তুলিয়া পার করিতেছেন, —বেগে নৌকা চালাইয়া মধ্য যমুনায় গিয়াছেন, এমন সময় প্রবল বাতাস উঠিল, নদীতে ভীষণ তরঙ্গ জন্মিল। শ্যামসুন্দর তরঙ্গ মুখে আড় ভাবে নৌকা ধরিলেন। নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইল, তথাপি গোপীদিগের মন বিচলিত হইল না। মধুসূদন পারের কর্ত্তা, সেই ভরসায় তাঁহারা নিশ্চিন্ত। বনমালী মুখ মলিন করিয়া বলিলেন, গোপীগণ! নৌকা বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না, এখন উপায়? গোপাঙ্গনারা অবিচলিত চিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মধুসূদন! "ধীরে নীরে কর পার, মাঝখানে ডুবিলে তরি কলঙ্ক তোমার।" মধুসূদন দেখিলেন, বিপদ কালেও তিনিই তাঁহাদের একমাত্র

নির্ভর স্থল; অম্লান ঈষৎ হাস্যমুখে সহজ ভাবে নৌকা ধরিলেন,—ধীরে যমুনা পার করিয়া দিলেন।

বস্ত্রহরণ ।

একদিন কাত্যায়নী-ব্রত সমাপন করিয়া রাধিকা, সহচরী ব্রজসুন্দরীগণ সহ স্নানার্থ যমুনায় গিয়াছেন। পরিহিত বসন তীরে খুলিয়া রাখিয়া বিবসনাবস্থায় যমুনা সলিলে অবগাহন করতঃ জলক্রীড়া করিতেছেন।* বনমালী দূর হইতে তাহা দেখিয়া, ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গোপবালা-দিগের অজ্ঞাতসারে বসনগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক তটস্থ এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। জলকেলি সমাপ্ত হইলে, গোপীগণ স্নান করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন,—বস্ত্র নাই। আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া, একটু এদিক ওদিক করিয়া দেখেন, পীতাম্বর, অম্বর হরণ করিয়া গাছে ঝুলাইয়াছেন, আর বৃক্ষোপরি বসিয়া সহাস্য বদনে পা দোলাইতেছেন।

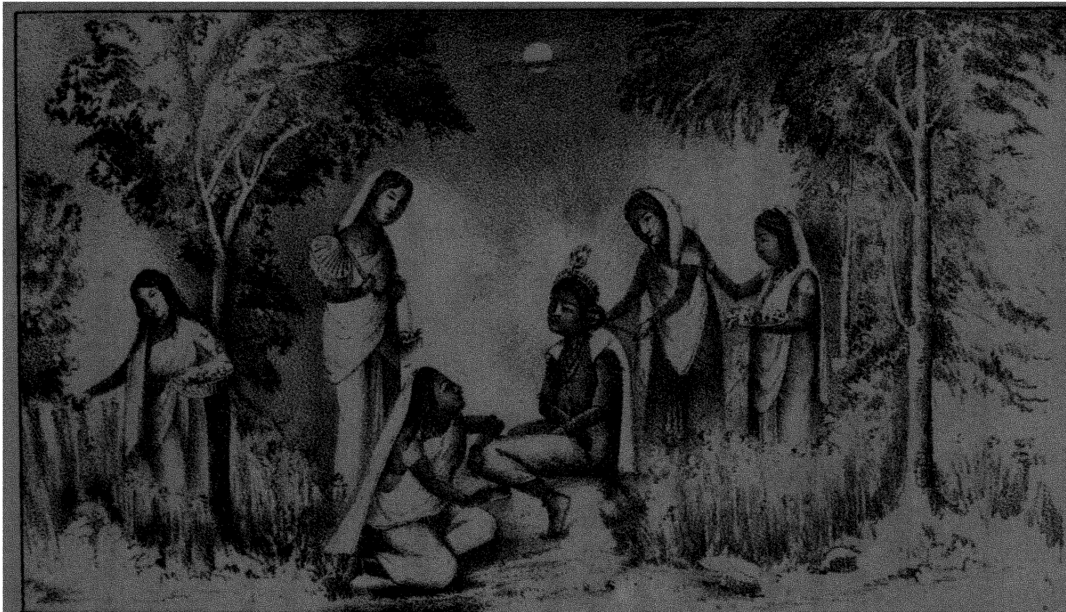
গোপযুবতীরা লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—এ কি? আমরা যুবতী রমণী, আমাদের বস্ত্রহরণ করিয়া কৌতুক করিতেছ,—এ তোমার কোন্ রঙ্গ? কেশব বলিলেন, তোমরা বিবসনাবস্থায় জলাবগাহন করিয়া যমুনার অবমাননা করিয়াছ, আমি তাহার

* বিবসনাবস্থায় জলাবগাহন প্রথা, এখনও ঐ অঞ্চলের স্থানে স্থানে আছে।

প্রতিশোধ না লইয়া বসন দিব না। গোপীগণ বলিলেন, আমরা না জানিয়া দোষ করিয়াছি,—ক্ষমা কর,—বসন দাও। কৃষ্ণ বলিলেন, তীরে উঠিয়া বসন গ্রহণ কর। গোপবালারা বলিলেন, বিবসনাবস্থায় তীরে উঠিব কিরূপে?—বস্ত্র ছুড়িয়া আমাদের হাতে ফেল। কৃষ্ণ শুনিলেন না। গোপাঙ্গনারা বিষম অনুপায়ে পড়িলেন। শীতে কাতর হইয়া জলে থাকিতে পারিতেছেন না, স্ত্রী-জীবনের অমূল্যরত্ন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তীরে উঠিতেও সক্ষম হইতেছেন না। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বড়ই কাতর হইলেন। শেষে অগত্যা হস্তাবরণে লজ্জা রক্ষা পূর্ব্বক, জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভিখারিণী হইলেন। তথাপি কৃষ্ণ বস্ত্র দিলেন না।

গোপীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বিনয় আরম্ভ করিলেন। ভগবানের দয়া হইল, তিনি তাঁহাদিগকে দিব্য-জ্ঞান দিলেন, অমনি অবিদ্যা দূরীভূত হওয়ায় ব্রজসুন্দরীরা বুঝিতে পারিলেন, —আমরা কাহার নিকট লজ্জা করিতেছি? যিনি অন্তর্যামী, তাঁহার নিকট আবার বহির্ব্বাসের আবরণ কেন? যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিব, লজ্জা বাকি রাখিলে, তাহা দেওয়া হইল কৈ? এই ভাবিয়া তাঁহারা হস্তাবরণ ভুলিলেন এবং আত্ম বিস্মৃত হইয়া তন্ময়-চিত্তে যোড় হস্তে ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। চিন্তামণি তখন বস্ত্রগুলি ফেলিয়া দিলেন।

যে লজ্জা নানাবিধ কুকার্য্য হইতে আমাদিগকে বিরত রাখে, যাহা মানব চরিত্রের ভূষণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান



নিকুঞ্জ বিহার।

নিকুঞ্জ বিহার।

ব্রজাঙ্গনারা দিনের বেলায় গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ ও প্রেমমাধুর্য্য সর্ব্বদাই তাঁহাদের মনে জাগে। বংশীধারী যমুনা পুলিনে বা নিকুঞ্জ বনে থাকিয়া যখন সুমধুর বংশীধ্বনি করেন, তখন গোপীদিগের মন চঞ্চল হইয়া উঠে। বাঁশীর শব্দ, যেন তাঁহাদের মনপ্রাণ ধরিয়া টানিতে থাকে,—তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন না। পুষ্প চয়ন অথবা জল আনায়নের ছলে গিয়া, কেশবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন। গোপীদিগের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা, এজন্য তাঁহার প্রতিই মাধবের প্রসন্নতা অধিক। কৃষ্ণের বাঁশী রাধা নাম লইয়া বাজে। সে রবে রাধিকার মন আনন্দে নৃত্য করে।

প্রতি দিন নিশীথকালে নিকুঞ্জবনে সকল গোপী মিলিয়া, কৃষ্ণ-পূজায় রত হন। কেহ ফুলের মালায় বনমালীকে সাজান, কেহ কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, অঙ্গে মাখেন, কেহ ফুল তুলসী চরণে ঢালেন, কেহ ব্যজন করেন। পূজা সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণনাম সঙ্গীত করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করেন। প্রেমাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়, প্রেমানন্দে বিভোর হইলে, শেষে বাহ্য-জ্ঞান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের এইরূপ অতুলনীয় প্রেম ভক্তিতে পুলকিত হইয়া মধুরভাবে সকলকে আদর সোহাগ করেন, যোগী-ঋষিদিগের দুষ্প্রাপ্য স্বর্গীয় আনন্দ দান দ্বারা সকলকে চরিতার্থ করেন। তাঁহারা সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া ভগবৎ-

প্রেমে মুগ্ধ হন এবং আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করেন।

শ্যামসুন্দর ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেম পরীক্ষার নিমিত্ত, কখনও তাঁহাদের সহিত রঙ্গতামাসা করেন, গোপীগণও রসিক চূড়ামণিকে উচিত উত্তর দিতে ছাড়েন না। এক দিন ব্রজাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবে মুগ্ধ হইয়া অন্তরে বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বৃন্দে বলিলেন, ঠাকুর! বলদেখি, তুমি কাহাকে অধিক ভালবাস? রসরাজ উত্তর করিলেন, —যে আমাকে অধিক ভালবাসে। শ্রীমতী বলিলেন,—তবে বুঝি আমাকে নয়? কেশব বলিলেন, তুমি কি আমায় ভাল বাস না? রাধিকা বলিলেন, তুমি অন্তর্যামী, সকলেরই ত মন জান? বনমালী বলিলেন, তবে ও কথা বলিতেছ কেন? শ্রীমতী বলিলেন, ভালবাসি,—প্রাণের সহিত বাসি, তথাপি মনের তৃপ্তি হয় না, সেই জন্যই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভালবাসার কি সীমা আছে যে, চরম সীমায় গিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে? ভালবাসিয়াও যাহার আশা মেটে না, তাহারই ভাল বাসা অধিক! মাধবের কথা শুনিয়া, শ্রীমতী মহা আনন্দিত হইলেন।

রাধিকা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! তোমার অমন মধুর বাঁশী,—ছাই রাধা নাম লইয়া বাজে কেন? শ্যামসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোমাকে ভালবাসিনা বলিয়া। শ্রীমতী বলিলেন, কৌতুকের কথা নয়, যখন মধুর বাঁশীতে মধুর গান গাও, তখন আরও মিষ্ট লাগে। কেশব বলিলেন,

তোমার নাম অপেক্ষা গান মিষ্ট, আমি তাহা বুঝি না। প্রেমময়ি !—

"সুধা মাখা নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে, সুধা মাখা হয় হৃদয় আমার।
ঐ নাম ধ'রে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি,
সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি, দেখি তোমায় সুধার আধার।",

শ্রীমতী শুনিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

রাস।

আজ, কার্ত্তিকের পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল কিরণে রজনী আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। জ্যোৎস্নার আলোকে রাত্রিকে দিন মনে করিয়া, বিহঙ্গমকুল মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে। কুঞ্জবনের শোভা একেই মনোহর, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল কিরণে আরও মনোহর হইয়াছে। শ্যামল-তটশালিনী-নীলাম্বুধারিণী-যমুনা, শারদ-পূর্ণিমার আনন্দময় নৈশ-গগনের শোভা বক্ষে ধারণ করিয়া আপনি হাসিতেছে, আর জগৎকে হাসাইতেছে। সুখস্পর্শ মৃদুসমীরণ, বনমল্লিকাদি নানাবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আজ, এই সুখের রজনীতে, মনোহর যমুনা তটে, শ্যামসুন্দর কলনাদে বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া, গোপীগণ চঞ্চলচিত্তে—যে যেরূপে পারিলেন, যমুনা পুলিনে শ্যামের নিকট উপস্থিত হইলেন। গোপীদিগকে উপস্থিত দেখিয়া, কেশব গম্ভীরভাবে বলিলেন, গোপীগণ! তোমাদের মঙ্গল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ? রাত্রিকালে এরূপে এখানে আসা ভাল হয় নাই, শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া পিতামাতার পরিচর্য্যাকর, পতি সেবা কর, এখানে বিলম্ব করিও না। আমার প্রতি প্রীতির জন্য, যদি আমাকে দেখিতে আসিয়া থাক, দেখা হইয়াছে, এখন চলিয়া যাও, সন্নিকর্ষ অপেক্ষা, ধ্যান অনুকীর্ত্তনাদিতে তোমাদের মনোমধ্যে আমার ভাবোদয় অধিক হইতে পারিবে, অতএব আর এখানে থাকিও না।

মাধবের ভাব দর্শনে গোপীগণ অবাক্ হইলেন এবং মহা দুঃখিত হইয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, কেশব!—এ কি কথা? তুমিই স্বর্গীয় আনন্দ দান দ্বারা আমাদের অসার-সংসারাশক্তি হ্রাস করিয়াছ, তোমার জন্যই আমরা কুল, মান, লজ্জা প্রভৃতি সাংসারিক ভয়ে ভীত নহি, তোকাকেই জীবন-সর্ব্বস্ব ভাবিয়া এবং তোমার সেবাতেই সকলের সেবা হয় জানিয়া, তোমার পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আজ তুমি আমাদের প্রতি এরূপ বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন করিতেছ কেন? আমরা বরং জীবন ত্যাগ করিব, তথাচ তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

গোপীদিগের এইরূপ মহা অনুরাগ সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া

এবং কাতরতা দেখিয়া কেশব গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গোপীগণ, কৃষ্ণের মধুর কথায় সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিলেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে লইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোপবালারা কেশবকে কখনও মধ্যে, কখনও পার্শ্বে রাখিয়া কিন্নর-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান আরম্ভ করিলেন,—

" তুমি এক জন হৃদয়ের ধন।
সকলে আপনার ভেবে সঁপি তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের কথা মনের ব্যথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে বলে সুখী তোমাকে,
সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞ্জন।

আনন্দ স্বরূপ তুমি তোমাধনে সকলে চায়,
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তোমার গুণ সকলে গায়।
জীবনের সর্ব্বস্বনাথ তুমি সুহৃদ্ সখা হও,
প্রেমে গ'লে যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও,
কেহ মনে কেহ ফুল চন্দনে পূজে তব শ্রীচরণ।

চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাও না চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবগ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবের বশ।
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন,
ভাব করে ডাকিলে এস ভাবনাকো জ্ঞানহীন।

আমরা সেই ভরসায় তোমার পানে চেয়ে আছি
নিরঞ্জন।

সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সকলে কৃষ্ণ-প্রেমে এরূপ উন্মত্ত হইলেন যে, কাহারও বাহ্যজ্ঞান রহিল না। মাথার কবরী খুলিয়া এলাইয়া পড়িল, অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া স্থান-ভ্রষ্ট হইল, তবু সে দিকে লক্ষ্য নাই। স্বর্গীয় প্রেমে বিভোর হইয়া,—বুঝি হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া রাখিবার জন্য, এক একবার প্রেমময়ের সহিত প্রিয়-আলিঙ্গন করিতেছেন, আর উন্মাদিনীর ন্যায় নৃত্য করি তেছেন। প্রেমাশ্রু প্রবাহে নয়নের কজ্জল বিধৌত হইয়া অঙ্গের বসন কালীময় হইতেছে।—আ মরি মরি, এই পাগলিনীর বেশে নৃত্যপরায়ণা ব্রজাঙ্গনাদিগের আজ যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে,—ভগবৎ-প্রেমে যাঁহাকে পাগল করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ব্রজদেবীরা যে আনন্দ অনুভব করিতেছেন,—প্রেমময়ের প্রেমে মাতিয়া, যিনি কখনও চক্ষের জল ফেলিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহার কিছু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই বিপুল আনন্দ ভোগ করিয়া ব্রজবালাদিগের মনে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য-গর্ব্ব উপস্থিত হইল। রসরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্য হইতে রাধিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই অসীম আনন্দের সময়ে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, গোপী-দিগের বিষম মর্ম্মপীড়া জন্মিল। তখন তাঁহারা চীৎকার করিয়া

কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, প্রেমময়! কোন্ অপরাধে তুমি আমাদের এই দুর্দ্দশা করিলে? যদি অজ্ঞানতা বশতঃ দোষ করিয়া থাকি,—ক্ষমাকর,—দেখা দাও। নতুবা তোমার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে।

গোপীগণ উন্মাদিনীর প্রায় হইয়া, বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে তাঁহার ও শ্রীমতীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, তথা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই দেখেন, শ্রীমতী মূর্চ্ছিতাবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত রহিয়াছেন। সখীগণ কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহার চৈতন্য জন্মাইলেন। সংজ্ঞা লাভ হইলে, রাধিকাও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া সকল গোপী পুনরায় কৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোপাঙ্গনারা অন্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক চতুর্ভুজ দিব্যপুরুষ নবজলধর শ্যামরূপে বন উজ্জ্বল করিয়া,শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। গোপীগণ নারায়ণের ঐ দিব্যরূপ দর্শনে বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু মুগ্ধ হইলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই। দ্বিভুজ-কৃষ্ণই তাঁহাদের উপাস্য, সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহাদের তৃপ্তি, সুতরাং কৃষ্ণগত-প্রাণা, কৃষ্ণ-প্রেমিকা, গোপবালাদিগের হৃদয়ে ঐ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থান পাইল না।

গোপীগণ ঐ দিব্যপুরুষকে প্রণাম করিয়া, অতি ব্যাকুলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের শ্যামসুন্দরকে কি এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন? তিনি কোথায় আছেন, যদি

জানেন, বলিয়া দিয়া আমাদের জীবন রক্ষাকরুন। গোপী-দিগের কথা শুনিয়া ভগবান মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন, তোমাদের জীবনসর্ব্বস্ব কেশব, এই বনেই আছেন। তোমরা এরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে বাহির করিতে পারিবে না। যমুনাতীরে গিয়া কৃষ্ণগুণ গানে প্রবৃত্ত হও; তাহাহইলে সেই স্থানেই তাঁহার দর্শন পাইবে।

ক্লান্তাগোপীগণ অবশেষে তাহাই করিলেন। তাঁহারা যমুনাপুলিনে গিয়া, ব্যাকুলমনে পুনরায় কৃষ্ণগুণ গানে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে রসরাজ সহসা তাঁহাদের মধ্যে দেখা দিয়া বলিলেন, সহচরীগণ! তোমাদিগকে এত ব্যাকুলা দেখিতেছি কেন? আমি কি তোমাদিগকে ভুলিতে পারি? ভক্তই আমার সর্ব্বস্ব, ভক্তের হৃদয়ই যে আমার প্রিয়-বাসস্থান। আমি ভক্তের একান্ত অধীন, তোমরা কি তা জান না? তবে যে কিছুকাল অদৃশ্য ছিলাম, সে কেবল প্রেম ও অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। বিরহ ভিন্ন, প্রেমের নূতনত্ব ও মাধুর্য্য থাকে না, বিরহ না ঘটিলে প্রেমের মাহাত্ম্যও বুঝাযায় না। বিরহই প্রেমকে দৃঢ় করে এবং সজীব রাখে। যে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে নাই, সে সম্মিলনের প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারে না।

ভগবান গোপবালাদিগকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া, প্রেমানন্দের স্বর্গীয় সুখ অনুভব করাইবার জন্য, পুনরায় তাঁহাদের সঙ্গে বিহার আরম্ভ করিলেন। এবার, প্রতিগোপীযুগলের মধ্যে পৃথক পৃথক কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবস্থিত হইলেন এবং দুই হস্ত, দুই পার্শ্বের দুই গোপীর স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে সজ্জিত হইলেন।

গোপবালাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সকলে কৃষ্ণ-নাম সঙ্গীত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, মহাসুখে রাসচক্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে প্রেমময়ের এই প্রেমলীলা দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তাঁহারা প্রেমময়ী গোপীদিগকে পরম সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিয়া অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান পরিশ্রান্তা গোপীদিগের সহিত যমুনায় গিয়া, জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজদেবীগণ আজ পূর্ণানন্দ ভোগ করিয়া, স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে, যাহা পাঠে আদিরস-প্রিয় ব্যক্তিরা আপনাদের মতানুযায়ী অর্থ করিয়া কুভাব আনিতে পারেন। কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ উহাতে গাঢ় প্রেমাবেশের লক্ষণ ও মাধুর্য্য ভাবেরই পরাকাষ্ঠা দর্শন করেন। লোকের রুচিদোষে ভাল জিনিষও অনেক সময়ে মন্দ হইয়া পড়ে। মানুষের চিত্ত, বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া সকলে ঐ পবিত্রভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। ভগবানে সকল সম্ভব হইলেও একটী অসম্ভব আছে, তিনি পবিত্রস্বরূপ, তাঁহাতে অপবিত্রতা অসম্ভব। অতএব শাস্ত্রের সে মর্ম্ম নহে; লোকে, প্রবৃত্তির দোষেই বিরুদ্ধ বুঝে।

ভগবান গোপবালাদিগের অকৃত্রিম প্রেমভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া রাসমণ্ডল বিহারে তাঁহাদিগকে যে স্বর্গীয় আনন্দ দান করিলেন, তাহা মহামহা যোগীদিগেরও দুষ্প্রাপ্য। চৈতন্যদেব সংসারে ধর্ম্মভাব শুষ্ক দেখিয়া, এই গোপী-প্রেমেই সমস্ত বঙ্গ দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রেমেই "শান্তিপুর

ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।” এই প্রেমভক্তির অতুল আনন্দের আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবকবিগণ বলেন, ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দসাগরের নিকট গোষ্পদ সদৃশ। তাঁহারা জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গকেই ঈশ্বর সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় বলেন। পরম ভক্ত প্রেমিককবি বিষ্ণুরাম, মধুর সঙ্গীতে গাইয়াছেন ;—

(১)

“ প্রেম যদি না থাকে মনে,
ও তার কি হবে ভজন সাধনে।
হাজার থাকুক জ্ঞান গরিমা, করুক সীমা অধ্যয়নে,
ওরে বারিযুক্ত না হলে কি শক্ত হয় শক্তু ভোজনে ?
প্রেমে যদি পাষাণ পূজে, প্রেমে যদি শ্মশান ভজে,
ওরে যার প্রেম সে নেবে বুঝে, সে কি পাষাণ শ্মশান গণে ?”

(২)

“ প্রেম বিনে কি সে ধন মেলে,
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।
জ্ঞান আলোকে দেখ্‌বে যদি প্রেমের তৈল দাওরে ঢেলে,
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোন আঁধারে ঘুরে মলে।
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে তো না, কি ধন মেলে প্রেম না হলে,
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বন্ধন কেটে দিলে।
প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে,
এ সব প্রেমের রাজ্য প্রেমের কার্য্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে,
প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ওরে প্রেম লয়ে যায় তাঁর কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে।
প্রাণ ছাড় তো প্রেম ছেড় না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে,
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে।

প্রেমময়ের রাজ্যে এই প্রেমের রাস নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। যে ভাবুক, সে-ই তাহা দেখিতে পায়, যে প্রেমিক, সে-ই তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়। গ্রহরাজসূর্য্য সেই রাসের নায়ক, পৃথিব্যাদি গ্রহতারকা সেই রাসের নায়িকা। পূর্ণানন্দময় সূর্য্যদেব সকলের স্কন্ধে কর স্থাপন করিয়া সকলকেই উৎফুল্ল করিতেছেন, প্রেমাধিনী নায়িকাগণ প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রেমে উন্মাদিনী প্রকৃতিদেবী বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছেন। প্রেমের টানে তাঁহার হৃদয়-সিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, তিনি কখনও বিদ্যুৎপ্রভায় অঞ্চল উড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখনও মেঘরাগে রাগ ভাজিয়া গম্ভীর স্বরে গান ধরিতেছেন, কখনও বা প্রেমাশ্রুপাতে ধরা প্লাবিত করিতেছেন। সূর্য্যদেব প্রেমের ভেল্কী দেখাইবার জন্যই বুঝি, এক এক বার সকলকে দুঃখের অন্ধকারে ডুবাইয়া অদৃশ্য হইতেছেন, আবার পূর্ণানন্দে প্রকাশ পাইয়া সকলকে পুলকিত করিতেছেন। বিধাতার বিধানে ঘূর্ণয়মান এই সৌর-রাস দেখিয়াও আমরা প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের আভাস পাই।

মানভঞ্জন।*

যেখানে প্রেমের আঁটা-আঁটি সেই খানেই মান অভিমান। অভিমান, প্রণয়ের ভেল্কী এবং প্রেম ওজনের তুলাদণ্ড। যিনি ভালবাসেন, তিনি কতটুকু ভালবাসেন, অভিমানে তাহার ওজন বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও ওজন বুঝিবার জন্য কেহ অভিমান করে না। প্রণয়ের পাত্রদ্বারা মনের অভিলাষ ষোল আনা পূর্ণ করিয়া লইতে বাসনা জন্মে, তাহাতে ত্রুটি হইলেই অপমান বোধ হয়, তখন সেই কৃত-অবমাননার প্রতিশোধ দিতেই মনে অভিমান জন্মে। অভিমান ভাল কি মন্দ, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই অভিমান মানুষের মধ্যে ত আছে-ই, দেব-লীলাতেও দেখিতে পাই। প্রেমময়ী-গোপবালাদিগের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা-তেও এই অভিমানের অভিনয় ঘটিয়াছে।

এক দিন রাত্রিকালে, শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রেম-পূজা গ্রহণের জন্য শ্যামসুন্দরের নিমন্ত্রণ ছিল। মাধব সে রাত্রিতে অন্য গোপীর পূজা গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু রাধার কুঞ্জে যান নাই। শ্রীমতী মালতীমালা, তুলসী, চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, ননী, সর, মাখন প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সারা-নিশা জাগরণ করিলেন,—মাধব

* মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধারণের মধ্যে, কৃষ্ণলীলার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ স্বরূপে গণ্য, এজন্য আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম না।

আসিলেন না। শ্রীমতী মহাদুঃখে এবং দারুণ অভিমানে অভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। সখীগণ দুঃখিত মনে শ্রীমতীর পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়-হয় এমন সময়ে কেশব ঈষৎ হাস্য বদনে শ্রীরাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীমতী ভূমি শয্যায় শয়নকরিয়া আছেন। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে, বিষাদ-বিষে মুখ-কমল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সখীদিগের মুখও অন্ধকার। গন্ধ মাল্যাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই,—আদর নাই, অভ্যর্থনা নাই, যেন কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

রসিকচূড়ামণি ব্যাপার বুঝিলেন। সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীমতীর কি কোন অসুখ করিয়াছে? তোমাদিগকেই বা এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কেহই কথার উত্তর দিল না। তখন শ্যামসুন্দর রাধে রাধে বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।—উত্তর নাই। বৃন্দে বিরক্তভাবে বলিলেন, সখী আমাদের, সারানিশা জাগিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘুমাইয়াছেন, তাঁহাকে ত্যক্ত করিও না। বনমালী বলিলেন, বুঝিয়াছি আমারই অপরাধ হইয়াছে, তোমাদের সখীকে ক্ষমা করিতে বল। এবার কথা বলার সুযোগ পাইয়া সখীরা একে একে শ্যামকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। রসরাজ সকলই গা পাতিয়া লইলেন,—প্রতিবাদ করিলেন না।

মাধবের কাতরতা দেখিয়া ক্রমে সখীদিগেরও মন নরম

হইল, তখন তাঁহারা শ্রীমতীকে শ্যামেরপ্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও রাধিকার দারুণ মান ভাঙ্গিল না। প্রেমিক ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্যই বুঝি; অবশেষে বনমালী, শ্রীরাধার চরণে ধরিয়া বিনয় করিতে লাগিলেন।* এত করিয়াও কিন্তু রাধিকার দারুণ মান ভাঙ্গিতে পারিলেন না। সেই নির্ব্বিকার পুরুষের পক্ষে মস্তক চরণ, মান অপমান, সকল সমান হইলেও, মানুষের চক্ষে ঘটনাটী বিস্ময়জনক বোধ হইল। সখীগণ শ্যামকে পায় ধরিতে দেখিয়া লজ্জায় আড়ষ্ট হইলেন। বৃন্দে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর তোমার লীলা তুমিই বুঝ ;—তোমার সকলই আশ্চর্য্য! তুমি——

পরের তরে আপন ভুলে, পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও,
পরম দয়াল, পরম ব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও,
সৃষ্টি তোমার পরের তরে, দৃষ্টি তোমার পরের পরে
পরের তরে অগুণ হরি, আকার ধরে সগুণ হও,
রাখিতে পরের মান, নিজের মান ছেড়ে দাও।
পরকে দিয়ে নিজের প্রাণ, পরের তরে চেয়ে লও।

---

* প্রবাদ আছে যে, পরমবৈষ্ণব কবিবর জয়দেব; ভগবানের এই পায় ধরার কথা সাহসকরিয়া প্রথমে গীতগোবিন্দে লিখিতে পারেন নাই। ভগবান স্বহস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" পাদ পূরণ করিয়া দিয়া, কবির মনে সাহস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্যামসুন্দরের অসীম সোহাগে শ্রীমতী আত্মহারা হইয়াছিলেন, একবার ভাবিলেন না,—আমি কে? শ্যামকে? রাধিকার আচরণে সখীগণও বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, রাই! দেখ্ তোর পদতলে কে? ক্ষমা কর্,—কথা ক, অত অভিমান ভাল নয়। যাহা রয় সয়, তাহাই করা ভাল। সখী-দিগের কথাতেও রাধিকার গুরুতর অভিমান দূর হইল না। তাঁহারা কৃষ্ণকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কৃষ্ণ তদনুসারে একটু অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সখীগণ বলিতে লাগিলেন, রাই! হৃদয়ের ধনকে পায় ঠেলিয়া তাড়াইলে, এখন যত পার অভিমান কর, তুমিও কান্দ, আমরাও কান্দি। এবার শ্রীমতী চক্ষু মেলিলেন, কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া, হা কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া, আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমতীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া সখীগণ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। রাধিকা, কৃষ্ণকে আনয়ন জন্য সখীদিগকে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন। বৃন্দে বলিলেন, তুমি দুর্জ্জয়মানে অভিভূত হইয়া তাঁহার বহু অবমাননা করিয়াছ, তাঁহাকে আনিতে বোধহয় আমাদের সাধ্য হইবে না। রাধিকা বলিলেন, সখি! যিনি মনপ্রাণ শীতল করেন, সেই কৃষ্ণ কি আমার অযত্নের ধন। তবে, যখন দারুণ বিরহানলে প্রাণ জ্বলে, তখনই তাঁহার প্রতি অভিমান হয়, তখনই তাঁহাকে মন্দ বলি। অভিমানে আত্মহারা হইয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি জ্ঞানময়, অন্তর্যামী,—সকলই বুঝেন, সকলই

জানেন। অবশ্যই আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আসিবেন। যাও, তাঁহাকে আনিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। বৃন্দে বলিলেন, তবে যাই, কিন্তু সাবধান, আর যেন আত্মহারা হইও না। এই বলিয়া বৃন্দে চলিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতীর নিকট উপস্থিত করিলেন। বনমালীকে দেখিয়া লজ্জায় রাধিকার কথা ফুটিল না। কিন্তু পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসিতে আসন দিলেন। ক্রমে লজ্জা গেল,—কথা ফুটিল। তখন তিনি না আসাতে গত রাত্রিতে যে বিষম মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই দারুণ অভিমানের জন্যই বুঝি শ্রীমতীকে দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বুঝিবার আমাদের তত আবশ্যক নাই। আমরা এই উপলক্ষে ভক্তের প্রতি ভগবানের ভালবাসার পরিমাণটা জানিয়া লইলাম,—ভক্তকে ভগবান কত আদর, যত্ন ও সোহাগ করেন, তাহাও বুঝিয়া লইলাম।

কলঙ্কভঞ্জন।

(১)

গোপবালারা দিনের বেলায় কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে গতিবিধি করিতেন; তাঁহাদের সমাজের মধ্যে ইহা দোষণীয় প্রথা ছিল না। কিন্তু নিশীথকালে, নিভৃত নিকুঞ্জবনে,

অথবা যমুনাপুলিনে, যুবতী গোপরমণীরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করেন, ইহা জানিতে পারিয়া অনেকে বিরুদ্ধ ভাবিতে লাগিল। তাহারা বিশ্বপতিকে উপপতি আখ্যা দিয়া কৃষ্ণ-প্রেমিকা গোপীদিগের চরিত্রে দোষারোপ আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ কুটিলা নামে রাধিকার এক অতিপ্রখরা ননদি ছিল, সে রাধিকাকে কৃষ্ণকলঙ্কী বলিয়া গঞ্জনা দিত। পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্য ফলে ভগবান দয়া করিয়া যাঁহাদিগকে স্বীয় রূপ, ঐশ্বর্য্য, প্রেম, দেখাইয়াছেন, তাঁহারা কি ঐ সামান্য নিন্দা ও গঞ্জনার ভয়ে কৃষ্ণসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহারা কৃষ্ণ-কলঙ্কের উপাধিকে অঙ্গের ভূষণ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু পরমভক্ত গোপবালাদিগের এই লৌকিক কলঙ্কটুকু থাকাও ভগবানের প্রাণে সহ্য হইল না।

একদিন শ্রীরাধা একাকিনী কুঞ্জবনে, বনমালীর সহিত প্রেম-বিহার করিতেছেন, কুটিলা ইহার সন্ধান পাইয়া, ভ্রাতা আয়ানকে বৃত্তান্ত জানাইল। আয়ান মহাক্রুদ্ধ হইয়া কুটিলার সহিত রাধিকার উদ্দেশে কুঞ্জবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীমতী বনমালীকে বনমালায় বিভূষিত করিয়া শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে নিকটে মনুষ্য-পদ-সঞ্চারের শব্দ পাইয়া, চকিত হইয়া দেখেন, কুটিলাসহ আয়ান আসিতেছেন। ভয়ে রাধিকার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি হতজ্ঞান হইয়া কাতরদৃষ্টিতে ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন, শ্যাম তখন শ্যামা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। করের বাঁশী অসি হইয়াছে, বনমালা মুণ্ডমালারূপে শোভা পাইতেছে। আয়ান দেখিলেন,

রাধিকা শবাসনা মুণ্ডমালিনী শ্যামার পদারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছেন। আয়ান কালীর উপাসক ছিলেন, তিনি শ্রীমতীকে মহাদেবী কালীর পূজা করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। রাধিকাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ও কুটিলাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। লজ্জায় কুটিলার আর কথা বলিবার উপায় রহিল না।

আয়ান ও কুটিলা চলিয়া গেলে, শ্যাম, পুনরায় শ্যামমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ঘটনা দর্শনে মাধবের অসীমদয়া স্মরণ করিয়া শ্রীমতী প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, দয়াময়? তুমি ধন্য, তোমার কৌশলও ধন্য। তোমার অনন্ত গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারি আমার এমন কি সাধ্য আছে? তোমার জ্ঞানবল আশ্চর্য্য, বিভব আশ্চর্য্য, নিয়মক্রম আশ্চর্য্য, করুণা আশ্চর্য্য,—তোমার সকলই আশ্চর্য্য। কিন্তু কেশব! তোমার অপেক্ষাও আমাদের একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে। কেশব বলিলেন,—কি? শ্রীমতী ঈষৎ হাস্য মুখে বলিলেন, আমরা তোমারই প্রদত্ত জীবন ধারণ করি, আর তোমাকেই ভুলিয়া যাই, তুমি দিন রাত্রি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ অথচ তুমি কে তাহা একবারও ভাবিনা। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? বনমালী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, না—না, সে তুমি নও,—তোমরা নও। মানবাকারে তেমন জীব অনেক আছে সত্য, কিন্তু তাহারাও আমার কৃপার পাত্র। আমার মঙ্গলময় শাসনে, সময়ে তাহাদেরও চৈতন্য জন্মিবে।

ভগবানের এই লীলাটীতে ভেদজ্ঞানী শাক্ত বৈষ্ণব দিগের কিছু বুঝিবার বিষয় আছে। তাহা এই,—তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, আকার ভেদ, তাঁহার ইচ্ছা ভেদ মাত্র।

(২)

প্রেমময়ী রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন আয়ানের নিকট হইল বটে, কিন্তু সাধারণে উহা ভালরূপে জানিতে পারিল না। ভক্তবৎসল-ভগবান সর্ব্বসমক্ষে রাধিকাকে নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

এক দিন নন্দরাণী নন্দদুলালকে লইয়া আদর করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা যশোমতীর কোলে গোপাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোপালের নবজলধর শ্যামবর্ণ নিষ্প্রভ হইল, চক্ষু স্থির হইল, হস্তপদ এলাইয়া পড়িল, চৈতন্য রহিল না। নীল-মণিকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া যশোদার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি,—“গোপালের একি ভাব হইল” বলিয়া কান্দিয়া উঠি-লেন।

রাণীর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি সকলে দৌড়িয়া আসিলেন; দেখিলেন, যশোদার কোলে গোপাল মূর্চ্ছিত হইয়া অচেতনবৎ পড়িয়া আছেন। নন্দ ব্যাকুলতার সহিত গোপাল গোপাল বলিয়া কত ডাকিলেন, গোপাল ডাক শুনিলেন না, চৈতন্যেরও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নন্দ ও যশোদা মাথা খুঁড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবাদ বৃন্দাবনময় রাষ্ট হইয়া পড়িল

বৃন্দাবনের সমস্ত গোপগোপী ও রাখালবালক, উৎকণ্ঠিত মনে দ্রুতপদে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। সকলে শোকাভিভূত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ভগবানের লীলা বুঝা ভার। তিনি এদিকে মাতৃক্রোড়ে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিলেন, ওদিকে বৈদ্যরূপী হইয়া জনতার মধ্যে দেখা দিলেন। বৈদ্য বলিলেন, তোমরা ব্যাকুল হইওনা আমি এই বালককে আরাম করিয়া দিতেছি। নন্দ ও যশোদা কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, গোপালকে যে বাঁচাইতে পারিবে, আমরা চিরকাল তাহার কেনা হইয়া থাকিব। বৈদ্যরাজ গোপালের হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, বড় কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, একটা নূতন কলসীর প্রয়োজন, শীঘ্র আন। কলসী আনা হইলে, তাহার নিম্নে একশত ছিদ্র করিয়া বৈদ্য কহিলেন, কোন সাধ্বীরমণী এই কলসী লইয়া যমুনা হইতে এক কলসী জল আনিলে, সেই জলে এখনই বালককে স্নান করাইতে হইবে। কিন্তু মাতা জল আনিলে, সে জলে উপকার হইবে না।

বৈদ্যের ফরমাইস শুনিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ চমৎকৃত হইলেন, এবং পরস্পর বলাকহা করিতে লাগিলেন,—এ কেমন কথা? একটাছিদ্র থাকিলে আমরা কলসীতে জল আনিতে পারিনা, জল পড়িয়া যায়, কাপড় ভিজিয়া যায়, এই শতছিদ্র কলসীতে জল আনা কিরূপে সম্ভব হইবে? ব্রজাঙ্গনাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়া বৈদ্য বলিলেন, তা হবে, সাধ্বীরমণী হইলে, সে

পারিবে, শীঘ্র জল আন, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা। ব্রজাঙ্গনা-দিগের মুখ শুকাইল।

কুটিলা সতীত্বের বড় গর্ব্ব করে। যশোদা অগ্রে তাহাকেই বলিলেন, বাছা! তুমি পরমাসতী, তুমি এককলসী জল আনিয়া আমার গোপালকে বাঁচাও। যশোদার বাক্যে কুটিলা মহাখুসী হইয়া কলসী লইয়া সগর্ব্বে জল আনিতে গেল। জলপূর্ণ করিয়া কলসী উঠাইবামাত্র শতধারায় জল পড়িয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কলসী শূন্য হইল। কুটিলা বিমর্ষভাবে শূন্যকলসী আনিয়া রাখিল এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন কুটিলার মাতা জটিলা দর্প করিয়া জল আনিতে চলিল। তাহারও ঐ দশা ঘটিল। ভয়ে আর কেহ কলসীর দিকে তাকায় না। যাহারা কাছে ছিল, সরিয়া পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। তখন যশোদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, হায়! বৃন্দাবনে কি একজনও সতী নাই? জল আনা বুঝি অসম্ভব হইল। বৈদ্যকে বলিলেন, আর কোন প্রক্রিয়া থাকে করুন।

বৈদ্য যশোদার বাক্য শুনিয়া সমস্ত গোপ রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনিই পরমা সতী, ইঁহা দ্বারাই কার্য্য উদ্ধার হইবে। বৈদ্যের কথা শুনিয়া কুটিলা হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন। বৈদ্যের যেমন অনুমান শক্তি, চিকিৎসাতেও বোধ হয় তেমনি পারদর্শিতা। বৈদ্যের কথা শুনিয়া, যশোদা রাধিকাকে বলিলেন, মা! তুমি শীঘ্র এক

কলসী জল আন। রাধিকা যশোদার কথা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অগত্যা কলসী তুলিয়া ভীতমনে ধীরে ধীরে যমুনার দিকে চলিলেন। কৃষ্ণের জন্য রাধিকার তত ভাবনা ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই মূর্চ্ছা জন্মিয়াছে; তবে কি ইচ্ছা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সচ্ছিদ্র কলসীতে কিরূপে জল আনিতে সমর্থ হইবেন, এই ভাবনাতেই বড় ব্যাকুল হইলেন। তিনি কলসী লইয়া বিমর্ষভাবে চলিতেছেন, আর বিপদহারী মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া কাতরপ্রাণে মনে মনে বলিতেছেন। হে বিপদ-ভঞ্জন, অনাথ-শরণ, পতিতপাবন! তোমার শ্রীচরণ ভবসাগরের তরি। দীননাথ! আমি যখনই কোন বিপদে পড়িয়াছি, বিপদভঞ্জন বলিয়া ডাকিলে, তখনই তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। দয়াময়! আজ এই ঘোর বিপদে পড়িয়া কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, আমাকে রক্ষা করিয়া তোমার শ্রীপদে স্থান দাও। নতুবা কলঙ্কের হ্রদে পড়িয়া আজ নিশ্চয়ই আমার জীবন অন্ত হইবে।

শ্রীমতী যমুনার জলে কলসী ডুবাইয়া, বড় ভয়ে-ভয়ে ধীরে-ধীরে কলসী উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, আমাকে নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য, যিনি কালীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কি আজ আমাকে এই কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইবেন? জানিনা ভগবান কি অভিপ্রায়ে কি করিতেছেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জল হইতে কলসী তুলিলেন। দেখিলেন, বিন্দুমাত্রও জল পড়িল না। শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণের দয়া স্মরণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া জনতাপূর্ণ বৈদ্যের সম্মুখে জলপূর্ণ কলসী রাখিলেন। চারিদিক

হইতে রাধিকার প্রশংসা আরম্ভ হইল। জটিলা ও কুটিলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। কলসীর জলে স্নান করাইবামাত্র গোপালের চৈতন্য হইল। নন্দ ও যশোদা হাতে আকাশ পাইলেন। এবং রাধিকাকে অশেষ প্রশংসা করিয়া প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বৈদ্যকে প্রচুর ধন দিতে উদ্যত হইলে, তিনি বলিলেন, তোমাদের পুত্রের নামে আমার নাম, তোমরা আমার পিতামাতার স্থানীয়, আমি তোমাদের নিকট হইতে পুরস্কার লইব না। নন্দ ও যশোদা বৈদ্যের বীত-স্পৃহা দর্শনে অধিকতর কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলেন, বৈদ্যরাজ! গোপালকে বাঁচাইয়া, তুমি আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমরা আজ অবধি তোমারই হইলাম। বৈদ্য মনে মনে হাসিতে হাসিতে বিদায় হইলেন।

মথুরা-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা ও কংসবধ।

কংস, কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্ম এপর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলই ব্যর্থ হওয়াতে তিনি মহা ভাবিত হইয়াছেন। এদিকে কংসবধে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, একদা দেবর্ষি নারদ মথুরায় কংসালয়ে উপস্থিত হইয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ তোমার সহজ শত্রু নহে। তুমি ওরূপে তাঁহাকে বিনাশ

করিতে পারিবে না। কোন ছলে তাঁহাকে মথুরায় আনয়ন কর। আত্মবশে আনিয়া উপযুক্ত বল প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট কর।

নারদের পরামর্শ কংসের মনে ধরিল। তিনি অবিলম্বে ধনুর্যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে রাম কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য অক্রূরকে রথসহ বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। অক্রূরের রথ বৃন্দাবনে পৌছিলে, রামকৃষ্ণ মহা সমাদরে তাঁহাকে রথ হইতে নামাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন। অক্রূর সম্পর্কে রামকৃষ্ণের পিতৃব্য, মহা বৈষ্ণব। রাম কৃষ্ণের তত্ত্ব তিনি জানেন। ভগবান বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে রাম কৃষ্ণকে দর্শন মাত্রেই তাঁহার মনে ভক্তির উদ্রেক হইল। তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া মনে মনে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে, অন্তর্যামী ভগবানও ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। রাম কৃষ্ণ পরম যত্নে পিতৃব্যকে আহার করাইয়া, তাঁহার নিকট মথুরার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। অক্রূর একে একে সমস্ত বিবৃত করিলেন। পিতামাতার কষ্টের কথায় ভগবান মনে ব্যথা পাইলেন। দুরাত্মা কংসকে শীঘ্রই সমুচিত শাস্তি দিতে ইচ্ছা হইল। কংস ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই যজ্ঞে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, শুনিয়া, সেই ইচ্ছা সম্পাদনের সুযোগ মনে করিলেন। অক্রূর দুরাত্মার দুশ্চেষ্টার কথাও গোপন রাখিলেন না, তাহা শুনিয়া ভগবান মনে মনে হাসিলেন।

কংস ধনুর্যাগ আরম্ভ করিয়াছেন, আর সেই যজ্ঞে রাম কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর আসিয়াছেন, ক্রমে

এই সংবাদ বৃন্দাবনবাসী সকলেই জানিতে পারিলেন। সংবাদ শুনিয়া নন্দ ও যশোদার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, গোপবালারা মর্ম্মাহত হইলেন এবং রাখাল সখাদিগের দুঃখের সীমা রহিল না। নন্দ ও যশোদা অক্রূরের সমীপস্থ হইয়া কাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, যজ্ঞে রাম কৃষ্ণের যাওয়া হইবে না। দুর্বৃত্ত কংস কৃষ্ণের চির শত্রু। বাল্যাবস্থা হইতেই কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্যে, দুরাত্মা কত চেষ্টা করিতেছে। যদিও সৌভাগ্য ক্রমে কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, কিন্তু ঘটিতে কতক্ষণ? অতএব যজ্ঞে ইঁহাদের যাওয়া হইবে না।

অক্রূর বলিলেন, নন্দরাজ! আপনি কাহার জন্য চিন্তা করিতেছেন। কৃষ্ণ কে? তাহা আপনারা চিনিতে পারেন নাই। যিনি অতি শৈশবে পুতনা বধ করিলেন; দুর্জ্জয় কালীয়-দমন, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি অমানুষিক কার্য্যগুলি, যাঁহার শৈশব-ক্রীড়া, পুত্র স্নেহে অভিভূত হইয়া আপনারা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তাঁহার অমঙ্গলের আশঙ্কা বৃথা। অক্রূরের প্রবোধ-বাক্য শুনিয়া এবং গমনার্থ রামকৃষ্ণের আগ্রহ দেখিয়া, নন্দ অগত্যা সম্মত হইলেন, কিন্তু যশোদা বলিলেন, অমঙ্গল যেন না-ই হলো, প্রাণধনকে ছাড়িয়া আমি ঘরে থাকিব কিরূপে? নীলমণিকে না দেখিয়া আমি যে মুহূর্ত্ত কালও সুস্থির থাকিতে পারি না।

অক্রূর বলিলেন, ছেলে যত দিন ছোট থাকে, তত দিনই তাহাকে কাছে কাছে রাখা সম্ভব, বড় হইলে, সেরূপ করা চলে না। কৃষ্ণ এখন একটু বড় হইয়াছেন, কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে

এখন মধ্যে মধ্যে অভ্যাস করিতে হইবে। অতএব ইঁহাদিগের গমনে বাধা দিও না, প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি কর। যশোদা অক্রূরের কথায় প্রবোধ মানিলেন না, কান্দিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, মা! কান্দিও না, কোন ভয় নাই। রাজ-নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা উচিত নয়। যজ্ঞ দর্শনে যাইতে আমাদিগকে সন্তুষ্ট মনে আদেশ কর। কৃষ্ণের কথায় যশোদা চক্ষের জল মুছিলেন, যাইতে অগত্যা অনুমতি দিলেন।

পিতা মাতা সম্মত হওয়ায় কৃষ্ণের আর দেরি সহিল না। রওনা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। গোপগণ সহ নন্দ বলিলেন, আমরাও যাইব। রাখাল সখাগণও যাওয়ার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, কৃষ্ণ সকলেরই গমনে সম্মতি দিলেন। তাঁহার আদেশে রাজা কংসকে উপহার দেওয়ার জন্য গোপগণ ভারে ভারে দধি দুগ্ধ লইয়া সকলে পৃথক পৃথক গাড়িতে মথুরায় যাত্রা করিলেন। অক্রূরের সহিত রামকৃষ্ণও রথে উঠিলেন।

রাধিকাদি কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীগণের ভরসা ছিল, যশোদা কৃষ্ণকে ছাড়িবেন না। এখন কৃষ্ণকে রথে উঠিতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলে ছুটিয়া আসিয়া রথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাধিকা কিছু বলিতে আসিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। চন্দ্রাবলী বলিলেন,—শ্যাম! তুমি এত নিষ্ঠুর তাহা জানিতাম না। যাওয়ার বেলায় আমাদিগকে দুটো কথাও বলিয়া যাইতে নাই? আমরা তোমাগত-প্রাণ, দগ্ধিয়া বধ করা অপেক্ষা একেবারে

প্রাণে মারিয়া যাও। তাহাহইলে তোমার দয়াময় নামটাও বজায় থাকিবে, আমরাও রক্ষা পাইব।

গোপীদিগকে আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মাধব বলিলেন, আমি রাজ-যজ্ঞ দর্শনে বড় ব্যস্ত হইয়া মথুরায় যাইতেছি,তোমাদিগকে বুঝাইতে গেলে কথা অনেক, সময় অল্প, তাই দেখা করি নাই। মথুরায় বেশী বিলম্ব হওয়ার সম্ভব নাই। তোমরা কাতর হইও না, গৃহে গমন কর। তোমরা আমার প্রাণের ধন, তোমাদিগকে কি আমি ভুলিতে পারি? কৃষ্ণের কথায় গোপীগণ কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধা হইলেন। প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবার বেশী সুযোগও পাইলেন না, পথ ছাড়িলেন,—রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতদূর দেখা যায়, গোপীগণ একদৃষ্টে রথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কৃষ্ণও সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। রথ অদৃশ্য হইল, গোপীগণ শূন্যমনে দগ্ধ-প্রাণে গৃহে ফিরিলেন।

রথ সারা দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে মথুরার প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হইল। রাম কৃষ্ণ রথ হইতে নামিয়া সমস্ত গোপগণের সহিত সন্নিহিত রম্য উদ্যানে রাত্রি যাপনের অভিপ্রায় জানাইয়া অক্রূরকে গৃহগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, আমরা প্রভাতে নগরের শোভা দর্শন করিয়া রাজ সমীপে গমন করিব। আমাদের আগমন সংবাদ আপনি অগ্রে গিয়া রাজাকে প্রদান করুন। অক্রূর তাহাই করিলেন। দৈত্যরাজ কংস রাম কৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনিয়া শত্রু বিনাশের উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, শ্রীদামাদি রাখাল-সখাদিগকে সঙ্গে করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ পূর্ব্বক নগরের শোভা সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অনুপম রূপের কথা লোক পরম্পরায় অল্পক্ষণের মধ্যে নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। মথুরার সমস্ত নর-নারী তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য, রাজপথের ধারে ধারে সারি বান্ধিয়া দাঁড়াইল। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ কেহ অট্টালিকার উপরে, কেহ বা গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণের অপরূপ রূপ দেখিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মাধবের পরিধান সেই পীতবাস, গলায় সেই বনফুলের মালা, মাথায় মোহন চূড়া, বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি, কর্ণে কুণ্ডল। সহচরগণসহ উভয় ভ্রাতা ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক নগরের শোভা দেখিয়া মোহিত হইতেছেন, আর নগর বাসীরা তাঁহাদের অপরূপ রূপের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, চক্ষে পলক পড়িতেছে না। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রূপ দেখিতেছে, আর নয়ন সার্থক হইল ভাবিতেছে। বনমালী, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণের সহিত প্রফুল্লমুখে রাজবাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদের উপর পুষ্প বর্ষণ আরম্ভ হইল। সকলে আনন্দে মত্ত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। মথুরাবাসী নর-নারীর হৃদয়ে আজ, অপার আনন্দ।

পথে দয়াময়ের কৃপাদৃষ্টিতে কত অন্ধ, খঞ্জ, বধিরের চির-কষ্ট দূর হইল। পরমভক্ত কুব্জা, পরমাসুন্দরী হইল। আবার শত্রু ভাব অবলম্বন করায় কংসের রজক শ্রীকৃষ্ণের চপেটাঘাতে জীবন হারাইল। ক্রমে তাঁহারা সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কংসের

শিক্ষানুসারে অনেক প্রহরী একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল এবং একটা মত্ত হস্তী তাঁহাদের সম্মুখে ছাড়িয়া দিল। কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ সহসা রক্ষীদিগের নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক ধনুক কাড়িয়া লইয়া ভঙ্গ করিলেন। তখন কংসের বহু সৈন্য একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দুই ভ্রাতা অসীম পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাতে তাহাদিগকে একে একে বধ করিলেন। অবশেষে চানুর ও মুষ্টি নামক দুই অতি বলবান মল্লের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারাও জীবন হারাইল। দেখিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়া নিস্তব্ধ বাভ ধারণ করিল। কংসের অবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত, ভয়ে পলায়ন আরম্ভ করিল। সাহায্য করিতে আর কেহ নাই দেখিয়া, কংসও পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিলেন। কংস আত্ম রক্ষার্থ চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইল। বাসুদেব মঞ্চ হইতে তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিলেন। এইবার কংসের মত্ততা দূর হইয়া হিত-বুদ্ধি জন্মিল। তিনি এই অন্তিম কালে ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ মহাপাপী কংসকে পাপমুক্ত করি-লেন। কংসের দৈত্য-লীলা ফুরাইল, ভগবানেরও পতিত-পাবন নাম সার্থক হইল।

রাজা কংস,—দৈত্য। দৈত্য বলিলে, পাপাচারী এক ভীষণ আকৃতি জীবের ভাব আমাদের মনে উদয় হয়, কিন্তু দৈত্য এই

মানুষ ছাড়া অপর কোন জীব নহে। এই মানুষই মনুষ্যত্ব হারাইলে, দৈত্য, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আবার এই মানুষই চরিত্র গুণে দেবপদ লাভ করে। দৈত্যকুলে জন্মিয়া প্রহ্লাদ,—দেবতা, আর ঋষি-পুত্র হইয়া রাবণ,—রাক্ষস।

ভগবান মানুষকে প্রাণী জগতের রাজা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল সাধন করিবে, এই অভিপ্রায়ে তাহার অন্তরে সৎপ্রবৃত্তি দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন, স্বাধীন মন ও চিন্তা দিয়াছেন, আত্ম রক্ষণ ও পরপোষণের জন্য শক্তি-সামর্থ্য দিয়াছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে তাহার উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার জন্যই সূর্য্য কিরণ দেয়, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে, পৃথিবী শস্য প্রসব করে, বৃক্ষলতা ফল-ফুল ধারণ করে। মানুষের প্রতি ভগবানের কত দয়া, কত স্নেহ; মানুষকে সুখে রাখিবার জন্য তাঁহার কত চেষ্টা এবং কত আয়োজন। কিন্তু এই সকল সুখ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়াও মানুষ যখন সৃষ্টি কর্ত্তাকে ভুলিয়া যায়, ভোগে মত্ত হইয়া পরপীড়ন, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান দ্বারা সৃষ্টিমধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করে, তখন আর তাহাতে মনুষ্যত্ব থাকে না। তাহার অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তি মুখ মণ্ডলে প্রস্ফুটিত হওয়ায়, সে ভীষণ আকৃতি ধারণ করে। এই রূপ দুরাচারেরাই দৈত্য, পিশাচ বা রাক্ষস। ইহারাই বিশ্বেশ্বরের বিদ্রোহী প্রজা। ভগবান ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য, শাস্তি প্রদান করেন বা সংসার হইতে একেবারে বিদূরিত

করেন। কংস এই জন্যই দৈত্য, এবং এই নিমিত্তই ভগবান তাঁহাকে সংসার হইতে বিদূরিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনষ্ট করিয়া, পিতা মাতাকে কারামুক্ত করিলেন। মাতামহ উগ্রসেনকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন। মথুরা বাসীরা নিরাপদে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে তিনি শ্রীদামাদি সখাদিগকে ও নন্দরাজকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা।

কংস বিনষ্ট হওয়ায় বসুদেব ও দৈবকীর দুঃখের দশা ঘুচিল। তাঁহারা কৃষ্ণ ও বলরামকে লইয়া মহাসুখে কালকর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এখন বড় হইয়াছেন, তাঁহার সে বাল-চাপল্য এখন আর নাই। পুরোহিত গর্গ, রাম কৃষ্ণের বৈদিক সংস্কার সমাধা করিয়া দিলে, তাঁহারা কাশীতে সন্দিপনী মুনির নিকট বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌষট্টি দিনে চৌষট্টি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এমন সর্ব্বজ্ঞ ছাত্রকে শিক্ষা দিতে মুনির কোন কষ্টই হইল না। কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছুক হইলেন। সন্দিপনী বলিলেন বাপু! যদি দক্ষিণা দিবে, তবে আমার অপহৃত পুত্রকে আনিয়া দাও। প্রভাসতীর্থে শঙ্খাসুর, সন্দিপনী পুত্রকে হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস, পুত্র জীবিত নাই। মুনি এখন গুরুদক্ষিণা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের

নিকট সেই পুত্রলাভ প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ সম্মত হইলেন। তিনি প্রভাসে গমন পূর্ব্বক পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া, গুরুপুত্রের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং জয়চিহ্ন স্বরূপ অসুর দিগের ভীষণ-নাদী এক শঙ্খ লইয়া আসিলেন। ঐ শঙ্খ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নামে বিখ্যাত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল, তিনি সর্ব্বদাই এই শঙ্খ ব্যবহার করিতেন।

পুত্র আনিয়া সন্দিপনীকে প্রদান করিলে, গুরু ও গুরুপত্নী মহা সন্তুষ্ট হইলেন। গুরু দক্ষিণা দিয়া, রামকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ ও বলরামের লৌকিক সংস্কার ও শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

হস্তিনার সংবাদ গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ গুরুগৃহ হইতে আসিলে, কিছুদিন পরে, শুনিলেন, হস্তিনায় পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব দিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেছেন না। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী, কৃষ্ণের পিসী; এজন্ত তিনি পিসীমার ও তাঁহার পুত্রগণের প্রকৃত অবস্থা জানিবার নিমিত্ত অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব দিগের এইরূপ একটি লৌকিক সম্পর্ক থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। কেহ কাহারও সংবাদ ও লয়েন নাই। কর্ত্তব্য বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণই প্রথম সংবাদ লইতে লোক পাঠাইলেন।

অক্রূর হস্তিনায় গিয়া বিদুরের নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রদিগের দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিলেন। কুন্তী ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই আমার পুত্রদিগের বিনাশ চেষ্টায় ফিরিতেছে। কখন্ কি বিপদ ঘটাইবে জানি না। বিষদানে ভীমকে বধ করিতে যত্ন পাইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কেশবকে বলিবে, আমরা এইরূপ সঙ্কটের অবস্থায় কালযাপন করিতেছি। একবার আসিয়া আমাদের দুঃখ দূর করিয়া গেলে ভাল হয়।

পাণ্ডবদিগের অবস্থা শুনিয়া অক্রূর দুঃখিত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে যথাসাধ্য বুঝাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইবে না জানিতে পারিলেন। তিনি কিছুদিন পরে মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণকে সমস্ত সমাচার জানাইলেন। কৃষ্ণ শুনিয়া মৌন ভাবে রহিলেন।

বৃন্দাবনের সংবাদ গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে চড়িয়া কংস-যজ্ঞে মথুরায় গিয়াছেন। শীঘ্র আসিবেন ভরসায়, বৃন্দাবনবাসীরা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণ আসিলেন না। বৃন্দাবনবাসীরা শেষে হতাশ হইয়া কৃষ্ণ-বিরহে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ বিনা, মা যশোদা শয্যাগত, তাঁহার চক্ষের জলের বিরাম নাই,—হা কৃষ্ণ ভিন্ন, মুখে অন্য কথা নাই।

গোপীদিগের আমোদ উৎসব ফুরাইয়া গিয়াছে, বিষাদের কালিমায় মুখ ঢাকিয়াছে, সে অপার আনন্দ, সে অসীম প্রফুল্লতা, সকলই বিগত হইয়াছে, তাঁহারা শূন্য-হৃদয়ে কেবল হা হুতাশ করিতেছেন। রাখাল-সখাদিগের গোচারণ আছে, কিন্তু গোষ্ঠ-ক্রীড়া নাই। অধিক কি কৃষ্ণের অভাবে বৃন্দাবনের পশুপক্ষীরাও যেন আনন্দ বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও যেন নষ্ট হইয়াছে। ধেনুবৎস আর পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল ভাবে বিচরণ করে না;—ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে না;—কোকিলের কুহুরব নাই,—ভ্রমরের ঝঙ্কার নাই,—পুষ্পবনের শোভা নাই। আনন্দময়ের সহিত সুখের সকলই গিয়াছে। বৃন্দাবনে আছে কেবল—আর্ত্তনাদ আর ক্রন্দন।

বৃন্দাবনের এই শোচনীয় অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া দয়াময়ের মনে কষ্ট হইল। তিনি পরম সখা উদ্ধবকে বলিলেন, সখে! বৃন্দাবনবাসীরা আমার বিরহে মৃত প্রায় হইয়া কালযাপন করিতেছে। তুমি বৃন্দাবনে গিয়া সকলকে প্রবুদ্ধ ও সুস্থির করিয়া আইস, নতুবা তাহারা বেশীদিন জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব বিলম্ব না করিয়া রথারোহণে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবনে গিয়া বৃন্দাবনের শ্রী-ভ্রষ্ট ও শোচনীয় অবস্থা দর্শনে উদ্ধবের মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি নন্দালয়ের দ্বারদেশে রথ রাখিয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নন্দ ও যশোদা কৃষ্ণ আসিয়াছেন মনে করিয়া, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, কৃষ্ণ নহে,—উদ্ধব। আবার

যে-সেই। শোকাশ্রু ফেলিয়া, আবার কান্দিতে বসিলেন। যশোদা বলিলেন, উদ্ধব! সংবাদ কি? গোপাল-আমার ভাল আছে ত? গোপাল কি আমাদিগকে মনে করে? উদ্ধব বলিলেন, মা! তিনি সর্ব্বদাই আপনাদের কথা ভাবেন। আপনাদিগকে সুস্থির হইতে বলিয়াছেন, কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে কিছুদিন মথুরায় থাকিতে হইবে; শীঘ্রই আপনাদিগের দুঃখ মোচন করিবেন। যশোদা বলিলেন, বাছা! গোপালের দোষ কি? আমরাই মহাপাতকী। গোপাল কি ধন, তাহা চিনিতে পারি নাই। সামান্য ননীর জন্য, বাছাকে মারিয়াছি, বান্ধিয়াছি, কতই লাঞ্ছনা করিয়াছি। গোপাল বুঝি সেই সকল কথা মনে করিয়া, এ মহাপাতকীদিগের মুখদর্শনে অভিলাষী নহে।

উদ্ধব বলিলেন, মা! ইহাও কি কখন হয়? পিতা মাতার শাসন পুত্রের মঙ্গলের জন্য, গোপাল তোমার মহাজ্ঞানী, তিনি কি তোমাদের দোষ ভাবিতে পারেন,—না সেই সকল কথা মনে করিয়া রাখিয়াছেন? তাঁহার মুখে তোমাদের আদর যত্নের কথাই সর্ব্বদা শুনিতে পাই। দেখ, কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে স্বয়ং আসিতে পারেন নাই বলিয়া, তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ কথায় উদ্ধব, নন্দ ও যশোদাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এদিকে নন্দালয়ের দ্বার দেশে রথ দেখিয়া, গোপীগণ মনে করিলেন, কৃষ্ণ বুঝি পুনরায় বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সকলে মহা উৎসাহে শুভ সমাচার দেওয়ার জন্য, রাধিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। সখীদিগের মুখে সংবাদ শুনিয়া শ্রীমতী বলিলেন,

না,—কৃষ্ণ আসেন নাই, কৃষ্ণ আগমনের লক্ষণ স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ আসিলে, নন্দালয়ে আনন্দ কোলাহল উঠিত, শুষ্ক তরুতে পল্লব জন্মিত, ধেনুবৎস হাম্বারব করিত, কোকিল ডাকিত, আমাদের চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিত। কৃষ্ণ আসেন নাই,—দেখ, আর কে আসিয়াছেন। রাধিকার সহিত সখীদিগের এই রূপ আলোচনা হইতেছে, এমন সময়ে, উদ্ধব নন্দালয় হইতে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধবকে দেখিয়া সকলের চক্ষু কর্ণের সন্দেহ মিটিল। সকলের শোকসিন্ধু প্রবল বেগে উথলিয়া উঠিল, প্রবল ধারায় চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

গোপীদিগের অবস্থা দর্শনে উদ্ধবের মনে বড় কষ্ট হইল। তাঁহাদের সোণার অঙ্গ কালী হইয়াছে, শোকের উচ্ছ্বাস মুখে ফুটিয়া পড়িতেছে, দেহ শীর্ণ হইয়াছে। দারুণ মর্ম্মবেদনায় কেহ কথা বলিতে পারিতেছেন না। উদ্ধব বলিলেন, গোপীগণ! তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য আসিতে পারিলেন না. তোমাদিগকে সুস্থির হইতে বলিয়াছেন,—কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। গোপীদিগের আর কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। বৃন্দে কহিলেন, মথুরার রাজা আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। রাজাকে বলিও আমরা বেশ আছি। আমাদের আহার আছে, নিদ্রা আছে, জীবন আছে, আমাদের অকুশল কি? রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল, তিনি ভাল আছেন ত?

গোপীমুখে এই নির্ব্বেদ-ব্যঞ্জক শোক-বাক্য শুনিয়া, উদ্ধব

কহিলেন, গোপীগণ! মধুসূদন, সর্ব্বদাই তোমাদের প্রেমভক্তির প্রশংসা করেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রেমভক্তির আধার গোপীরা আমার হৃদয়ের ধন, ভক্ত গোপীদিগের হৃদয় আমার প্রিয় বাসস্থান। আমি মুহূর্ত্ত কালের জন্যও তাহাদের ছাড়া নাই। তাহারা একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিলেই আমাকে হৃদয় মধ্যে দর্শন পাইবে। তাহাদিগকে সুস্থির হইতে বলিবে।"

এবার শ্রীমতী বলিলেন, উদ্ধব! আমাদের প্রেমভক্তির কথা যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই দয়ায় জন্মিয়াছিল, তিনি বজায় রাখিলে, থাকিবে। আমরা তাঁহার ক্রীড়া-পুত্তলি। তিনি যেমন নাচাইবেন. আমরা তেমনি নাচিব। মারিলে মরিব, বাঁচাইলে বাঁচিব। আমরা তাঁহারই তালে মানে নাচি, ভাল মন্দ তিনিই জানেন। তাঁহার কার্য্যের ভালমন্দ বিচার আমরা কি করিব? সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই কেহ ছত্রধারী, কেহ দীনভিক্ষারী হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, ইচ্ছা হইলে তৃণকে পর্ব্বত, পর্ব্বতকে তৃণ করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আমাদের মান, অভিমান, দর্প, অহঙ্কার যাহা কিছু হইয়াছিল, সকলই তাঁহাকে লইয়া। এখন সে সুখ-সৌভাগ্য সকলই গিয়াছে, আছে কেবল, পূর্ব্বসুখস্মৃতিজন্য মর্ম্মবেদনা, আর অশ্রুজল। এ অবস্থায় কি জীবন ধারণ করা যায়? অতএব কেশবকে বলিও, তাঁহার প্রেমাধিনী অনন্যগতি গোপবালাদিগের জীবন রক্ষা করিতে যদি ইচ্ছা হয়, তবে যেন শীঘ্র একবার দেখাদেন। তিনি হৃদয়ে উদয় হইয়া দর্শন দিবেন বলিয়াছেন, যদি দয়া করিয়া দেন, দেখিয়া চরিতার্থ হইব। উদ্ধব!

আমরা গোয়ালার মেয়ে, আমাদের ধ্যান আছে, না জ্ঞান আছে? বেদ-বেদান্তে যাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, মহা মহা যোগী ঋষি জীবনের অবসান পর্য্যন্ত দিন রাত্রি ধ্যান করিয়া যাঁহার দর্শন পান না, আমাদের কি সাধ্য যে, ধ্যান যোগে তাঁহাকে হৃদয়ে আনিব? অতএব তাঁহার দয়া ভিন্ন, আমাদের গত্যন্তর নাই।

উদ্ধব বলিলেন, তোমারা দুঃখিত হইও না, তোমাদের প্রতি কেশবের অসীম অনুগ্রহ। তিনি অন্তর্যামী, তোমাদের অবস্থা সকলই জানিতেছেন,—সকলই বুঝিতেছেন। মানুষ দুঃখ চায় না সত্য, কিন্তু আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করি, মঙ্গলময়ের ব্যবস্থায় তাহাও অনেক সময়ে আমাদের হিতকারী বন্ধু। তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছেন, আমরা তাহার কি বুঝিব? সেই অভ্রান্ত বিচারকের নিকট অব্যবস্থা হইবে না, তিনি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল করিবেন। গোপীদিগকে এই রূপে প্রবোধ দিয়া, উদ্ধব রাখাল বালকদিগের নিকট গমন করিলেন। রাখালেরা কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুলতা জানাইলেন,—কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্ধব যথোচিত উত্তর দিয়া ও প্রবোধবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, কিছু দিন পরে মথুরায় প্রতিগমন করিলেন।

মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনের যথাযথ অবস্থা বর্ণন করিলেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার আবার অজ্ঞাত কি? তিনি বৃন্দাবনের অবস্থা সকলই জানেন, তথাচ লৌকিক কর্ত্তব্য রক্ষা করিবার জন্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধবের

মুখে বৃন্দাবনের সংবাদ শুনিয়া, কিছু বলিলেন না, তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন।

জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসীদিগের সুখ-শান্তি বিধান করিয়া পরম সুখে মথুরায় বাস করিতেছেন। এমন সময়ে মগধাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ বহু সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিলেন। জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যাকে কংস বিবাহ করেন। কংস বিনষ্ট হইলে তাঁহার ঐ পত্নীদ্বয় পিতৃ ভবনে গমন করিয়া পিতাকে দুঃখের কথা জানান। তাহাতে জরাসন্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃষ্ণের সহিত যাদবদিগকে ধ্বংস করিবার অভিলাষে মথুরা আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন।

বলরাম, পরাক্রান্ত যাদবদিগের অধিনায়ক হইয়া জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। অবশেষে জরাসন্ধ পরাস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তিনি অত্যধিক সৈন্যের সহিত আসিয়া আবার মথুরা আক্রমণ করিলেন। এবারেও যাদবেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রকারে সপ্তদশ বার বিমুখ হওয়ার পর, জরাসন্ধ ভীষণবীর কালযবনের সহিত মিলিত হইয়া বহু ম্লেচ্ছ-সৈন্যের সহিত অষ্টাদশবারের আক্রমণোদ্যোগ

করিতেছেন, জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন, ক্রুর-শত্রু জরাসন্ধ নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। ব্রহ্মার বরে যাদবদিগের অবধ্য বলিয়াই তাহার আস্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার বাড়িয়াছে। অতএব পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে বলক্ষয় করা অপেক্ষা যাদবদিগকে লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য। তিনি স্বীয় অভিপ্রায় যাদবদিগের নিকট প্রকাশ করিলে, তাঁহারা বলিলেন, আমরা আপনার একান্ত অনুগত ও আশ্রিত; আপনার যাহা অভিপ্রেত, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব আপনি যে স্থান মনোনীত করিবেন, আমরা সেই স্থানেই যাইব।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সমুদ্রকূলে উন্নত-পর্ব্বত-বেষ্টিত দ্বারকা নগরী যেমন শত্রুদিগের দুরাক্রম্য তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। চল, আমরা সেই স্থানে গিয়া বাস করি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যাদবগণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মধুসূদন, যাদবগণসহ দ্বারকায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ম্লেচ্ছ-বীর কালযবন, মথুরা আক্রমণ করিল। জরাসন্ধও বহু সৈন্য লইয়া মথুরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, কালযবনের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, নিরস্ত্রভাবে এক পর্ব্বতের গুহা আশ্রয় করিলেন। কালযবনও তাঁহার অনুসরণ আরম্ভ করিল। ঐ গুহায় মুচুকুন্দ নামে এক ঋষি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন কৃষ্ণভ্রমে তাঁহাকে পদাঘাত করে। ঋষি জাগরিত হইয়া যেমন কোপদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, অমনি সে ভস্ম হইয়া গেল। কালযবন বিনষ্ট হইলে, তাহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইহার অব্যবহিত

পরেই জরাসন্ধ বহু সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারেও বিমুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর কৃষ্ণ পিতা মাতা ও সমস্ত যাদবগণ সহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। দ্বারকায় মনোহর পুরী নির্ম্মাণ ও রৈবতক পর্ব্বতোপরি শ্রেণীবদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এখন তথায় গমন করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে জরাসন্ধ দুরাক্রম্য দ্বারকাভিমুখে আর যান নাই।

দ্বারকা-লীলা।

রুক্মিণীর বিবাহ।

শ্রীকৃষ্ণ যাদবদিগের সহিত মনোহর দ্বারকা নগরীতে পরম সুখে বাস করিতেছেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। পত্রের সমাচার এই,—"দয়াময়! আমি বিদর্ভরাজ-ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী। পিতা ও ভ্রাতা আমার স্বয়ংবর ঘোষণা করিয়াছেন, এবং জরাসন্ধের প্রস্তাবানুসারে, দুরাত্মা শিশুপালের সহিত আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমি ঋষিদিগের মুখে আপনার রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদির কথা শুনিয়া, আপনাকেই মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমাকে আপনার পত্নীর অযোগ্য বিবেচনা করেন, শ্রীচরণ সেবার নিমিত্ত দাসীরূপে গ্রহণ করিলেও আমি চরিতার্থ হইব। দীননাথ! আপনি ভক্তবৎসল, দয়া করিয়া উপায়হীনা রুক্মিণীকে

উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীচরণে স্থান দান করুন এই প্রার্থনা। আমার পিতা ও ভ্রাতা আপনার অত্যন্ত বিপক্ষ, সুতরাং আমার বাসনা তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের সাহায্যে শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইলাম। আপনি উপেক্ষা করিলে, বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাচ দুর্ব্বৃত্ত শিশুপালকে ভজনা করিতে পারিব না। যদি আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনায় সম্মত হন, তাহাহইলে, আমাকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না। আমি স্বয়ংবরের পূর্ব্বদিন কাত্যায়ণীর পূজা করিতে সখীগণসহ বহির্গত হইব। পূজা শেষে বাটীতে প্রতিগমন সময়ে আপনি ক্ষত্রিয় প্রথানুসারে আমাকে হরণ করিয়া অনায়াসে শ্রীচরণে স্থান দিতে পারিবেন।”

বাসুদেব রুক্মিণীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও সদ্‌গুণের কথা এবং তাঁহার স্বয়ংবরের সংবাদ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এই পত্র পড়িয়া মনে মনে হাসিলেন এবং পত্র বাহক ব্রাহ্মণকে বলিলেন, দ্বিজবর! আপনি সত্বর বিদর্ভ নগরে গমন পূর্ব্বক, দেবী রুক্মিণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলুন, আমি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, যেন তদনুসারে কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনরায় বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন এবং গোপনে রাজকুমারী রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের সানুরাগ উত্তর জানাইলেন। রুক্মিণী মহা সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, যখন মধুসূদনের দয়া হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মনের বাসনা সফল হইবে।

স্বয়ংবরের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক যথাসময়ে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইলেন। স্বয়ংবরের পূর্ব্বদিন প্রভাত সময়ে বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী, অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, সখীগণসহ জগন্মাতা কাত্যায়নীর পূজার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সৈন্যগণ সশস্ত্র হইয়া, কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইল। রাজনন্দিনী মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মহামায়ার পূজা সমাপন করিয়া রাজপুরীতে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, রুক্মিণীর হস্তধারণ করতঃ তাঁহাকে রথে উঠাইলেন এবং সারথি দারুককে দ্বারকাভিমুখে বেগে রথ চালাইতে অনুমতি করিলেন। রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণের কার্য্যে ভীষ্মকের রাজপুরীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জরা-সন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজগণ অপমানিত হইয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য, সশস্ত্র ধাবিত হইলেন। বলরাম, যাদবসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া রাজগণকে প্রত্যাক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত করিলেন। ভীষ্মকপুত্র রুক্মী, বহু সৈন্যসহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বধোদ্যত হইলে, রুক্মিণী কাতর ভাবে অচ্যুতের নিকট ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সকাতর প্রার্থ-নায় শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া রুক্মীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সমস্ত যাদবগণ দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দ্বারকানাথ যথা নিয়মে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

রুক্মিণী ব্যতীত সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি আরও সাতটী রমণী শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন। প্রত্যেকের গর্ভে তাঁহার দশ দশটী পুত্র জন্মে।

উষাহরণ।

রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে দশ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে প্রদ্যুম্ন তৃতীয় পুত্র। এই প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ পরম রূপবান ছিলেন। মহাপরাক্রমশালী বাণ রাজার ভুবন-মোহিনী কন্যা উষা, অনিরুদ্ধের রূপে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হন। বাণের মন্ত্রিকন্যা চিত্রলেখা, উষার প্রাণের সখী ছিলেন। তিনি দূতীরূপে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া গুপ্তভাবে অনিরুদ্ধের নিকট উষার অতুলনীয় রূপগুণের বর্ণনা করেন। তাহা শুনিয়া অনিরুদ্ধেরও উষার প্রতি অনুরাগ জন্মে। তিনি চিত্রলেখার সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে রাজকুমারীর সমীপে লইয়া গেলে, উভয়ে উভয়ের রূপ দর্শনে মোহিত হইলেন। গন্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাদের বিবাহ হইল। বিবাহের সাক্ষী কেবল চিত্রলেখা। আর কেহ এই ব্যাপার জানিতে পারিল না। কিছু দিন পরে ঘটনা প্রকাশিত হইলে, বাণরাজা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে যাদবগণ অনিরুদ্ধের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলেন, তিনি বাণরাজার পুরীতে কারারুদ্ধ আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য যাদবসৈন্য লইয়া শোণিতপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, বাণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান মহাদেব, রক্ষী স্বরূপে তাঁহার পুরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্রে বাণরাজা ছিন্নবাহু হইলে ত্রিপুরারী, কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিলেন। তাহাতেই বাণের প্রাণ রক্ষা হইল। বাসুদেব এই প্রকারে বাণকে পরাজয় পূর্ব্বক ঊষাসহ অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠসদৃশ দ্বারকা নগরীতে যাদবগণসহ সুখে বাস করিতেছেন। একদা পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পরমা সুন্দরী কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া বলরাম সাত্যকি প্রভৃতির সহিত পঞ্চাল দেশে গমন করিলেন। ভুবনমোহিনী পাঞ্চালীর বিবাহার্থী হইয়া দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি নানাদেশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরাও ছদ্মবেশে ঐ সভায় গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদিগকে বধ করিবার জন্য, তাঁহাদের

বারণাবন্তের আবাস গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহ দগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হন নাই। তাঁহারা দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করেন এবং ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশী।

দ্রুপদ রাজা একটী সুকৌশল সম্পন্ন লক্ষ্য রচনা করিয়াছিলেন। যে তাহা ভেদ করিতে পারিবে, সে-ই দ্রৌপদীকে লাভ করিবে, এই তাঁহার পণ ছিল। লক্ষ্য ভেদ করিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকেই অকৃতকার্য্য হইলেন। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিও সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ইঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া ছদ্মবেশী অর্জ্জুন উঠিলেন। তাঁহাকে এই দুষ্কর কার্য্য সাধনে উদ্যত দেখিয়া, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি ভীষণ ধনুকে শরসংযোগ করিয়া, অনায়াসে লক্ষ্য ভেদ করিলেন সুতরাং দ্রৌপদী অর্জ্জুনের প্রাপ্য হইলেন। ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে সামান্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। তাই সভাস্থ সমস্ত লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ঈর্ষ্যাবশে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অমিতবলশালী ভীম, ভ্রাতার সহায় হইয়া দুইজনে মিলিয়া সমস্ত রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, রাজগণ! যিনি লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, দ্রৌপদী ধর্ম্মতঃ তাঁহারই লভ্য, অতএব ক্ষান্ত হউন। তাঁহারা কৃষ্ণ-বাক্যে নিরস্ত হইয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রৌপদীকে লইয়া পাণ্ডবেরা আপনাদের আবাসস্থান ভার্গব-কর্ম্মশালায় গমন করিলেন। মাতা কুন্তীকে বলিলেন, আজ আমরা এক অপূর্ব্ব জিনিব পাইয়াছি। মা বলিলেন, পঞ্চ ভ্রাতায় বিভাগ করিয়া লও। শেষে দেখেন, একটী সুন্দরী কন্যা, তখন মাতা আপনার কথা প্রত্যাহার করিতে চাহিলেন কিন্তু মাতৃভক্ত পাণ্ডবেরা মাতার প্রথম আদেশ পালনার্থ পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

এই স্বয়ংবর স্থলেই পাণ্ডবদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ। পাণ্ডবদিগের গুণ-গ্রামের কথা তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কেবল চক্ষের দেখা ছিল না। কৃষ্ণ স্বয়ংবর সভায় ছদ্মবেশধারী পঞ্চ ভ্রাতাকে চিনিয়া, তাহা বলরামের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া ভার্গব-কর্ম্মশালায় গমন করিলে, কৃষ্ণ ও বলরাম তথায় গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কৃষ্ণ-আত্ম-পরিচয় দিয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিলেন। রামকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া পাণ্ডবেরা মহা আনন্দিত হইলেন। উভয় পক্ষ পরস্পরকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদিগকে, চিনিলে কি রূপে? কৃষ্ণ বলিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি অপ্রকাশিত থাকে না," গুণ দেখিয়াই আপনাদিগকে চিনিয়াছি। অনন্তর রামকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। কুন্তী তাঁহাদের নিকট আপনাদের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বাসুদেব পিসীমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, আপনি খেদ করিবেন না,

আপনাদের দুরবস্থা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। এইরূপে রামকৃষ্ণ আলাপ সম্ভাষণাদি দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া সে দিন আপন শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন বিবাহের যৌতুক স্বরূপ পাণ্ডবদিগের নিকট বৈদূর্য্য মণি এবং বহুমূল্য বসন, ভূষণ, শয্যা,যান, অশ্ব, গজ, দাস, দাসী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উপহার পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াও এখন ভিখারী কিন্তু কৃষ্ণ উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে রাজযোগ্য বৈভবশালী করিয়া দিলেন। পাণ্ডুদিগের নিকট উপহার প্রেরণ করিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম যাদবগণসহ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের সমাচার পাইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তাঁহারা হস্তিনায় গেলে, অন্ধরাজ তাঁহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে বাসের অনুমতি করিলেন, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করতঃ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কুরুক্ষেত্র-মিলন।

প্রভাস মিলন বলিয়া যাত্রা গানে যে বিবরণ শুনি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নাই। ভাগবতে কুরুক্ষেত্র মিলন আছে, তাহার বিবরণ যাত্রা গানে যাহা শুনি, কিয়দংশে তাহার সহিত ঐক্য আছে। বোধহয়, এই মিলনই প্রভাস-মিলন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

একদা সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে যাদবগণ সহ কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। কেবল প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতিকে নগর রক্ষার্থ দ্বারকায় রাখিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বসুদেবাদির আগ্রহে তথায় বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেন। তিনি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর, তাঁহার যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি কুরুক্ষেত্রে লোক সংগ্রহ জন্য, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে বিদর্ভ, কেকয়, কাম্বোজ প্রভৃতি ভক্ত নৃপতিবৃন্দ এবং নারদ, চ্যবন, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি যোগী-ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহা পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া কৌরবেরা এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরাও সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। আপনাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধনকে দেখিবার জন্য, বৃন্দাবন হইতে নন্দরাজ সমস্ত গোপগোপীগণসহ তথায় আসিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে ভক্ত নৃপতি, ঋষি, গৃহী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের আগমনে, কুরুক্ষেত্র, লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেই কৃষ্ণদর্শনে আসিয়াছেন, সকলেরই মুখে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে লাগিল।

মনোহর বিস্তৃত সভাগৃহের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রামকৃষ্ণ সমাগত রাজা ও ঋষিদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বসুদেব আগন্তুক আত্মীয় স্বজনের শিবিরে গমন পূর্ব্বক আলাপ আপ্যায়িত দ্বারা সকলের সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে পাণ্ডবদিগের শিবিরে গমন করিলেন। কুন্তীদেবী ভ্রাতাকে পাইয়া সজল নয়নে তাঁহার নিকট দুঃখের কাহিনী বর্ণন

করিতে লাগিলেন। বসুদেবও নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। অতঃপর তিনি নন্দরাজের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। সমুচিত সম্ভাষণের পর, বসুদেব নন্দরাজকে বলিলেন, আপনি আমার অসময়ের বন্ধু, রোহিণীকে আশ্রয় দিয়া, রাম কৃষ্ণকে বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়া আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। আপনার নিকট আমি চির-ঋণী। বসুদেবের বাক্যাবসানে নন্দরাজও যথোচিত বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। যশোদাকে দেখিয়া দৈবকী ও রোহিণী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব মহিষীগণ এবং বৃন্দাবনের গোপীগণ, কৃষ্ণ-ললনাগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় দ্বারা সুখলাভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ উৎসুক মনে সভাগৃহে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, নন্দ ও যশোদাকে দেখিয়া রাম কৃষ্ণ ছুটিয়া তাঁহাদের নিকটে গেলেন। নন্দ ও যশোদার স্নেহযত্নের কথা মনে উদয় হইয়া রামকৃষ্ণের চক্ষে জল আসিল। দুই ভাই তাঁহাদের নিকটে গেলেন, বাষ্পভরে অবরুদ্ধকণ্ঠ থাকায় প্রথমে কিছু বলিতে পারিলেন না। পরে কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনারা আমাদের প্রতি স্নেহ শূন্য না হইয়া এখানে আসিয়াছেন, ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। যে আমাকে না

ভুলে, আমিও তাঁহাকে ভুলি না এবং সেই ব্যক্তি শীঘ্র আমার শান্তিময় ধাম প্রাপ্ত হয়। যশোদা রাম কৃষ্ণকে কোলে করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন। ব্রজগোপীগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া স্থিরনয়নে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হৃষীকেশ পৃথক গৃহে রাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া, নিজেই বলিলেন। তোমরা কি আমাকে স্মরণ কর? অকৃতজ্ঞ ভাবিয়া আমাকে অবজ্ঞা কর না ত? আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। আমার প্রতি স্থিরভক্তি থাকিলে, মোক্ষ লাভ হইতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃই আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ ভক্তি জন্মিয়াছিল, উহা যেন বিচলিত হয় না। তৎপরে ভগবান, গোপীদিগকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, সমাধি দ্বারা ভগবানের মায়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া মানব জন্ম সফল করিলেন। সমাধির অবসানে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, কেশব! তোমার যে পাদপদ্ম যোগীরা নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করেন এবং যাহা সংসারী জীবের পক্ষে এই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরণী, সেই পাদপদ্ম গৃহস্থ হইলেও সর্ব্বদা আমাদের মনে উদিত হউক।

গোপীদিগকে চরিতার্থ করিয়া, ভগবান পুনরায় সভাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাম ও কৃষ্ণ এবং সভায় উপবিষ্ট সমস্ত রাজগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। যথো-

চিত অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য! যে সাধুসেবায় সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হয়, আমরা সেই দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বর দিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ঋষিগণ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া বলিলেন, জনার্দ্দন! আপনি সাধু-প্রতিপালক, তাই আমাদের এরূপ সম্মান করিলেন। আপনিই আমাদের একমাত্র আরাধ্য, আপনার জন্যই আমরা ত্রিলোকে পূজনীয়। আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিতে আমরা এখানে আসিয়াছি। আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

ঋষিদিগের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে হাসিলেন, এবং নানা জ্ঞানগর্ভ আলাপে তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা গমনোদ্যত হইলে, বসুদেব নমস্কার করিয়া বলিলেন, কি রূপে আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইবে, আপনারা তাহার আজ্ঞা করুন। বসুদেবের কথা শুনিয়া, ঋষিগণ ভাবিলেন; কৃষ্ণ কি ধন, পুত্রস্নেহে বসুদেব তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই এই রূপ প্রশ্ন করিলেন। সন্নিকর্ষই এই অনাদরের কারণ। সেই নিমিত্তই গঙ্গার তীরবর্ত্তী লোক, গঙ্গা ছাড়িয়া অন্য তীর্থে গমন করে। নারদ কহিলেন, বসুদেব! কর্ম্মদ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয়। শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করাই কর্ম্ম বন্ধন মোচনের উপায়। নারদের বাক্য শুনিয়া, বসুদেব যজ্ঞ সম্পাদন জন্য ঋষিদিগকে ঋত্বিকের কার্য্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহারা সম্মত হইয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করাইলেন।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, রাজা, ঋষি ও সুহৃদ্বর্গ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের গোপগোপীরা কিছুদিন কুরুক্ষেত্রে থাকিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সকলে চলিয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণ যাদবদিগকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

সুভদ্রা-হরণ।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন। একদা অর্জ্জুন কোন অনিবার্য্য কারণে যুধিষ্ঠিরের নিরূপিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইলেন। তিনি স্বীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পাইয়া অত্যন্ত সমাদরের সহিত আপনার আলয়ে রাখিলেন।

একদিন যদুবংশীয় নর-নারীগণ কোন উৎসবোপলক্ষে রৈবতক পর্ব্বতে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুভদ্রার অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া অর্জ্জুন মোহিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, সখে! তুমি পরিব্রাজক তথাপি তোমার চিত্তবিকার দেখিতেছি কেন? অর্জ্জুন লজ্জিত

হইয়া বলিলেন, সুভদ্রা তোমার অবিবাহিতা ভগিনী, বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, আমি কি সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে পারি না? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমার সহিত ভদ্রার বিবাহ হয়, ইহা আমার প্রার্থনীয় এবং হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা কি? বিবাহে অবশ্য স্বয়ংবর প্রথা অবলম্বিত হইবে। অপরিণতবুদ্ধি ভদ্রা স্বয়ংবর কালে কাহার প্রতি অনুরক্তা হইবে, তাহার ত নিশ্চয়তা নাই। অতএব সুভদ্রাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে কি না, তাহা বলিব কি রূপে? অর্জ্জুন বলিলেন, তবে পরামর্শ কি?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিবাহার্থী হইয়া বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করা বীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসার কার্য্য এবং ক্ষত্রিয়নিয়ম সঙ্গত। অতএব স্বয়ংবর সময়ে তুমি বলপূর্ব্বক ভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ কর, ইহাই আমার পরামর্শ। অর্জ্জুন তাহাতেই সম্মত হইলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, পিতা বসুদেব ও ভ্রাতা বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সুভদ্রার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা গোপন রাখিলেন। সুভদ্রার স্বয়ংবর কথা শুনিয়া নানা দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দ্বারকাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন এই অবকাশে দূত দ্বারা মাতা কুন্তী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সুভদ্রাকে বিবাহ করিবার অনুমতি আনাইলেন।

স্বয়ংবরের আয়োজন সমস্তই হইয়াছে, একদিন সুভদ্রা সখীদিগের সহিত রৈবতক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন

করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রথে তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। অর্জ্জুনের কার্য্যে যাদবেরা মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন-কৃত অবমাননার প্রতিশোধার্থে কৃষ্ণের কোন চেষ্টা নাই দেখিয়া, বলরাম, কৃষ্ণকে অশেষ ভর্ৎসনা করিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়াছেন; তিনি আমাদের বংশের অবমাননা করা দূরে থাকু, বরং গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বংশ, মর্য্যাদা সর্ব্ববিষয়েই পার্থ প্রার্থনীয় পাত্র। সুতরাং ভদ্রা পার্থের সহধর্ম্মিণী হওয়া সকল রকমেই মঙ্গলজনক বিবেচনা করি। আর অর্জ্জুনকে পতিলাভ করা ভদ্রারও বাঞ্ছনীয় হইবে। অতএব আমার মতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার করে ভদ্রাকে অর্পণ করা উচিত।

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া বলরামের ক্রোধ শান্তি হইল। তিনি যাদবদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর বসুদেবের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সাদরে গ্রহণ করিয়া যথা নিয়মে তাঁহার সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিলেন।

সুভদ্রার বিবাহ বৃত্তান্ত কাশীদাসের বাঙ্গালা মহাভারতে অন্যরূপ বর্ণিত আছে। যাঁহারা শুধু তাহাই পড়িয়াছেন, তাঁহারা ব্যাস-রচিত সংস্কৃত মহাভারতের এই প্রকৃত বিবরণ অবগত নহেন।

খাণ্ডব দাহন।

সুভদ্রার বিবাহের পরই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের রাজধানীতে গমন করেন। তাঁহাদের রাজধানীর নিকটে খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ বন ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অর্জ্জুন তাহা দগ্ধ করেন। ঐ বন পূর্ব্বে শ্বেতকি নামক এক রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। শ্বেতকি বহুকালব্যাপী বিপুল যজ্ঞ করায় সেই যজ্ঞের ঘৃতপানে অগ্নির মন্দাগ্নি-রোগ জন্মে। তিনি ব্রহ্মার নিকটে নিজের রোগের বৃত্তান্ত জানাইলে, ব্রহ্মা বলিলেন, খাণ্ডব বন ভক্ষণ কর, তাহাহইলে রোগ আরাম হইবে। ব্রহ্মার বাক্যে অগ্নি তাহাই করিলেন। খাণ্ডব দগ্ধ হইতে লাগিল; বনের মধ্যে যে সকল জীব জন্তু ছিল, তাহারাও পুড়িতে আরম্ভ হইল। তখন জীব জন্তুরা, —যাহার যেরূপ সাধ্য, অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদের সহায় হইয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অগ্নির বন ভক্ষণের চেষ্টা ক্রমে সাত বার বিফল হইল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজপুরীতে গমন করিলেন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট ক্ষুধার্ত্ত ভাব জানাইয়া ভোজনের প্রার্থী হইলেন। তাঁহারা আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, অগ্নি নিজ-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বিবরণ বলিয়া, খাণ্ডববন ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন, যদি তাহাতে তৃপ্তি জন্মে, চলুন তাহাই ভক্ষণ করাইব। কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন সশস্ত্র হইয়া তখনই অগ্নির

সঙ্গে খাণ্ডবে গমন করিলেন। পুনরায় বন পুড়িতে আরম্ভ হইল। বারি বর্ষণ দ্বারা ইন্দ্রও নির্ব্বাণ করিতে আসিলেন। এই উপলক্ষে ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দেবতারা ইন্দ্রের সহায় হইলেন। তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ইন্দ্র, অর্জ্জুনের বাণে অস্থির হইয়া বজ্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল, "ইন্দ্র! ক্ষান্ত হও, কাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ? নর-নারায়ণকে চিনিতে পারিতেছ না?" দৈববাণী শুনিয়া ইন্দ্র নিরস্ত হইলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে অগ্নি ইচ্ছামত উদর পূর্ত্তি করিলেন। বন পুড়িয়া নিঃশেষ হইল। বনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিংস্র জীব অগ্নির উদরসাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদিত হইল, আর রাজধানীর সমীপস্থ হিংস্র জন্তু-পূর্ণ একটী প্রকাণ্ড বন নষ্ট হইয়া গেল, পাণ্ডবেরা দুই প্রকারে উপকৃত হইলেন।*

---

* ব্যাসদেব মহা কবি। কবিগণ নানা অদ্ভুত অলঙ্কারে বর্ণনীয় বিষয় সজ্জিত করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণে প্রয়াস পান। উদ্দেশ্য,—বর্ণনার সৌন্দর্য্য সাধন, সত্যগোপন নহে। অলঙ্কারে ঢাকা থাকে বলিয়া, কবির লেখার মধ্যে সত্য দেখিতে হইলে, অনেক সময়ে অলঙ্কার সরাইয়া দেখিতে হয়। এই খাণ্ডব দাহন ব্যাপারটীতে অলঙ্কার আছে।

রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ।

একদা দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদিগের রাজধানী খাণ্ডব প্রস্থে উপস্থিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিতে যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিলেন। নারদের প্রস্তাবে সকলেরই মত হইল, যুধিষ্ঠিরেরও মত হইল, কিন্তু তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞপুরুষ কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিব রাজসূয় যজ্ঞ করা আমার সাধ্যায়ত্ত কি না। এই ভাবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমাচার বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিল, রাজা যুধিষ্ঠি আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দূত-মুখের, সমাচার শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের রাজধানীতে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য সম্ভাষণাদির পর বলিলেন, কেশব! নারদ আমাকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃগণের এবং সুহৃদ্বর্গেরও তাহাতে মত হইয়াছে, কিন্তু আমি তোমার সম্মতি গ্রহণের অপেক্ষায় আছি। তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব যজ্ঞের ঈশ্বর। তোমার মত বিনা আমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছি না। এই যজ্ঞ করিতে হইলে, রাজ-চক্রবর্ত্তী হওয়া চাই, সকল রাজার পূজ্য হওয়া চাই; আরও কি চাই তাহা তুমি জান. অতএব বল, আমি যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত পাত্র কি না?

কৃষ্ণ বলিলেন, রাজন্! আপনি সর্ব্ব গুণান্বিত, আপনি ঐ যজ্ঞ করিতে পারেন। কিন্তু মহাবলশালী মগধাধিপতি পাপিষ্ঠ

জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে পারেন না। জরাসন্ধ এখন সম্রাট স্থানীয়,—আপনি নহেন। ঐ দুরাত্মা রাজসূয় যজ্ঞের অভিলাষী হইয়া, তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, এবং অমিত পরাক্রমে নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ রাখিয়াছে। অভিপ্রায়,—যজ্ঞকালে তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। রাজন্! জরাসন্ধের অসীম পরাক্রম। তাহার জন্যই আমাদিগকে মথুরা ছাড়িয়া দুরাক্রম্য রৈবতক পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত দ্বারকা নগরীতে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে। অতএব অগ্রে ঐ দুরাত্মাকে বধ করিয়া, পরে আপনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, সফল-কাম হইতে পারেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, জনার্দ্দন! তুমি যাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পার নাই, তাহাকে বিনাশ করিয়া যজ্ঞ করা কি আমার সাধ্য? কৃষ্ণ বলিলেন,—অসাধ্য নয়। সেই দুরাত্মা ব্রহ্মার বরে যাদবদিগের অবধ্য। তথাপি আমরা তাহার প্রতিবারের আক্রমণই বিফল করিয়াছি। তাহার সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধে যাদবসৈন্য ক্ষয় হইতেছিল বলিয়া, আমরা দ্বারকার দুরাক্রম্য রৈবতক পর্ব্বতের আশ্রয়ে আছি। যুধিষ্ঠির বলিলেন, যদি সাধ্য হয়, তবে তাহার উপায়ও তোমাকে করিতে হইবে। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীম ও অর্জ্জুনকে আমার সঙ্গে দিন্, তাহাহইলেই দুরাত্মা বিনষ্ট হইবে। কৃষ্ণের কথায় অতুলবলশালী ভীমার্জ্জুনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাঁহারা মহা উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির বলিলেন, কেশব! তোমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তোমরা সৈন্য সামন্তের সাহায্য বিনা কি রূপে সেই

প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধকে বিনাশ করিবে? ভগবান বলিলেন, তাহার উপায় আমি করিব, আপনার সেজন্য চিন্তা নাই। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্যে সম্মত হইলেন।

জরাসন্ধ বধ।

জরাসন্ধের সৈন্যবল অত্যন্ত অধিক। এজন্য সম্মুখ সমরে তাহার সহিত আঁটিয়া উঠা দুষ্কর ভাবিয়া, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিবেন, এই কল্পনা করিয়া ভগবান চক্রপাণি শুধু ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া জরাসন্ধ বধে যাত্রা করিলেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ ষড়-অশীতি সংখ্যক নৃপতিকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছে। শততম পূর্ণ হইলেই তাঁহাদিগকে বলি দিবে। লোকহিতকারী ভগবানের মনে ইহা নিয়ত জাগিতে-ছিল। যে দুরাচার সৃষ্টির বিশৃঙ্খলাকারী সে-ই তাঁহার শত্রু। এই জন্য তিনি কংসকে বিনাশ করিয়াছেন এবং এই জন্যই জরাসন্ধের বিনাশ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনসহ জরাসন্ধের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। জরাসন্ধ তখন পুরীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। পুরীর মধ্যে প্রবেশ ভিন্ন তাহার সহিত সাক্ষাতের উপায় নাই, অথচ শত্রুভাবে যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছেন ইহা জানাইলে, পুরদ্বারেই একটা গোলযোগ বাধিয়া কতকগুলি নিরপরাধী সৈন্য বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা আপনাদের পরিচয়

ও অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন এবং স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞশালায় জরাসন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখন আর পরিচয় গোপনের আবশ্যক নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং আপনাদের অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিলেন, আমাদের তিন জনের মধ্যে যাহার সহিত তোমার ইচ্ছা তাহারই সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পার।

জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ভীমও প্রস্তুত হইলেন। দুই জনে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। দুইজনেই তুল্যবলশালী, সাধ্যমত উভয়েই উভয়কে পীড়ন করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। একবার ভীম জরাসন্ধকে অন্যায়রূপে পীড়ন করাতে কৃষ্ণ দুঃখিত হইয়া অন্যায় পীড়ন করিতে ভীমকে নিষেধ করিলেন। পাপীকে জগৎ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা আছে, তথাচ অন্যায় রূপে নহে। নিজের গড়া দ্রব্য কি সহজে ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয়? তিনি যে স্থলে বুঝিয়াছেন, পাপীকে জগতে রাখিলে, তাহার পাপভার আরও গুরুতর হইবে এবং জগতেরও বিশেষ অনিষ্ট হইবে, সেই স্থলেই কেবল পাপীর বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তাহাতে পাপীর এবং জগতের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বত্রই পতিত পাবন, সকল সময়েই মঙ্গলময়।

চৌদ্দদিন যুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে বধ করিলেন। কৃষ্ণ অবরুদ্ধ রাজাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজগণ মুক্তিলাভ করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, অধীনদিগের প্রতি কর্ত্তব্যের অনু-

মতি করুন। কৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, যজ্ঞ সময়ে আপনারা সকলে তাঁহার যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। রাজগণ অবনত মস্তকে কৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর কৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে পিতৃ সিংহাসনে বসাইয়া ভীমার্জ্জুনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে জরাসন্ধের বিনাশ ও রাজগণের মুক্তি সমাচার শুনিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন জন্য পরামর্শ দিয়া, দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

অর্ঘ গ্রহণ ও শিশুপাল বধ।

জরাসন্ধ বধ হইয়াছে, কৃষ্ণের অনুমতি পাইয়াছেন, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় মহা উৎসাহে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। খাণ্ডব-দাহ-সময়ে ময় নামে এক দানব দগ্ধ হইয়া মরিতে ছিল। অর্জ্জুনের অনুগ্রহে সে জীবন লাভ করে। সেই ময়দানব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এরূপ নিপুণতার সহিত যজ্ঞগৃহ নির্ম্মাণ করিল যে, তেমন কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর গৃহ, কেহ কখনও দেখে নাই। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা, ঋষি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যজ্ঞদর্শনের জন্য

নিমন্ত্রিত হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ, নানা শ্রেণীর লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। সমারোহের সীমা রহিল না। আয়োজন অনুষ্ঠান উচিতাধিক হইল।

পাণ্ডবদিগের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। কোন বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি না ঘটে, তিনি তাহার পর্য্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন। রাজমণ্ডলীর সমাবেশে সভাগৃহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। যোগ্য পাত্র বাছিয়া পৃথক পৃথক ব্যক্তির প্রতি, পৃথক পৃথক কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল।

যজ্ঞ সভায় যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুঝিয়া অর্ঘ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্মের কথানুসারে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান করিলেন। মহাপরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল, কৃষ্ণের পরম শত্রু। কৃষ্ণকে অর্ঘ দেওয়ায় তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কোন্ গুণ দেখিয়া কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করা হইল? অর্ঘ রাজার প্রাপ্য হইলে, কৃষ্ণ রাজা নন্, বয়োবৃদ্ধের প্রাপ্য হইলে, কৃষ্ণের পিতা বসুদেব উপস্থিত। আত্মীয় কুটুম্বের প্রাপ্য হইলে, শ্বশুর দ্রুপদ রাজা পাইতে পারেন। আচার্য্যের প্রাপ্য হইলে, দ্রোণাচার্য্যের পাওয়া উচিত ছিল। ঋত্বিকের প্রাপ্য হইলে, বেদব্যাস পাইলেন না কেন? কোন্ হিসাবে কৃষ্ণকে অর্ঘ দেওয়া হইল, কিছুই বুঝিলাম না।

শিশুপালের কথা ফুরায় না, তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞান-হীন, দুরাত্মা, কাপুরুষ। তিনি যে সকল কার্য্য

করিয়াছেন, তাহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। তেমন কাজ একজন বালকেও করিতে পারে। পাণ্ডবেরা ভীরু, নীচ প্রকৃতি; তাই প্রিয়কামনা করিয়া কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক, আজ এই নিমন্ত্রিত রাজগণের অবমাননা করিলেন এবং আপনাদের নিকৃষ্ট স্বভাবের পরিচয় দিলেন। ভীষ্মকেই বা কি বলিব; তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী, তাই যুধিষ্ঠিরকে এরূপ পরামর্শ দিয়াছেন; কৃষ্ণের ত কথাই নাই, তিনি নির্লজ্জ বলিয়া অযোগ্য হইয়াও এই নৃপতিবর্গের মধ্যে আপনি অর্ঘ গ্রহণ করিয়াছেন। শিশুপালের মনে যত আসিল, এই প্রকারে কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও পাণ্ডবদিগকে গালাগালি দিলেন।

শিশুপালের গালাগালিতে কৃষ্ণের লাভ লোক্সান কিছুই হইল নাবটে, কিন্তু আমাদের একটা উপকার হইল। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মূর্খেরা কৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের প্রেম সম্বন্ধে অপবিত্রতার আরোপ করেন, কৃষ্ণের পরম শত্রু শিশুপালও তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার কত নির্দ্দোষ কার্য্যে দোষ ধরিয়া শিশুপাল গালাগালি দিয়াছিলেন, ঐ সম্বন্ধে দোষ থাকিলে কি রক্ষ ছিল,—সর্ব্বাগ্রেই তিনি ঐ কলঙ্কের কথা উল্লেখ করিতেন। অতএব ঐ মূর্খদিগের সংশয় দূর করিবার পক্ষে ইহা অকাট্য প্রমাণ। যে সকল লেখক শাস্ত্রের বিরুদ্ধার্থ ঘটাইয়া অল্পজ্ঞানী সরলচিত্ত পাঠকদিগের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল করিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের নিকট অপরাধী,—ভগবানের নিকট অপরাধী। তাঁহাদের পুস্তক অপাঠ্য, তাহা স্পর্শ করিলেও পাপ হয়।

শিশুপাল ঐরূপ গালাগালি দিয়া সক্রোধে নিজ দলভুক্ত নৃপতিদিগের সঙ্গে সভা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির শিশুপালের নিকট গিয়া বিনীত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! ক্ষান্ত হও, তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বজনপূজিত কৃষ্ণের নিন্দা করিলে, মহামতী ভীষ্মের অপমান করিলে, কৃষ্ণ কে? ভীষ্ম কে? তাহা চিনিতে পারিলে না। যাঁহারা তোমা অপেক্ষাও প্রাচীন এবং জ্ঞানী তাঁহারাও ইঁহাদিগের সম্মান করেন। অতএব ক্ষান্ত হও, কৃষ্ণ অর্ঘ পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ দেওয়া হইয়াছে। ইহা লইয়া আর গোলযোগ করিও না।

যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্যে শিশুপালের চৈতন্য হইল না। বরং অধিকতর ক্রোধ জন্মিল। তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন, পুরুষোত্তম কৃষ্ণের পূজায় যে অসন্তুষ্ট, জ্ঞান-গর্ভ বিনীত বাক্যে সে শান্ত হইবে না। যিনি ত্রিলোকের পূজনীয়, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, সর্ব্বলোক হিতকারী, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং সর্ব্বগুণের আধার, তিনি উপস্থিত থাকিতে, অর্ঘ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে? কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান সর্ব্বাংশেই শ্রেয়ঃ হইয়াছে, ইহাতে যিনি অসন্তুষ্ট, তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। ভীষ্মের কথা শুনিয়া, শিশুপাল তাঁহাকে আবার নভূত নভবিষ্যতি রকমের গালি দিলেন, কৃষ্ণকেও ছাড়িলেন না। অবশেসে বলিলেন, ভীষ্ম! এই রাজগণ ইচ্ছা করিলে এখন তোমার জীবন লইতে পারেন। ভীষ্ম বলিলেন, শিশুপাল! তুমি যাঁহাদের ভরসায় এই গর্ব্ব করিতেছ, সেইসকল নরপতিকে আমি তৃণ

তুল্য জ্ঞান করি। সকলের মস্তকে এই পদাঘাত করিলাম, যাঁহার যাহা সাধ্য, করুন। আমরা যাঁহাকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছি, সেই কৃষ্ণও এই সম্মুখে বিদ্যমান, যাঁহার রণ-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি এই শিমুল বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করুন। কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়া কিছু বলিতেছেন না বটে, কিন্তু মৃত্যু কামনা হইয়া থাকিলে ইঁহাকেও যুদ্ধে আহ্বান করিতে পার। ভীষ্মের কথা শুনিয়া এবং স্বপক্ষীয় রাজাদিগের নিকট উৎসাহ পাইয়া, শিশুপাল আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কৃষ্ণকেই যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, গোবিন্দ! আইস, আজ সপাণ্ডব তোমাকে যমালয়ে পাঠাই।

শিশুপাল কৃষ্ণের পিসাত ভাই. কৃষ্ণ-বিদ্বেষী দুর্দ্দান্ত পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য পিসিমার অনুরোধ ছিল। সে শত অপরাধও ছাড়াইয়া গিয়াছে, পাপ পূর্ণ হইয়াছে। শিশুপাল যুদ্ধার্থ আহ্বান করায় কৃষ্ণ উঠিলেন এবং সভাস্থ সমস্ত রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত শিশুপালের পূর্ব্ব দুর্ব্ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। আর বলিলেন, এই পাপিষ্ঠ আজ যে দুর্ব্ব্যবহার করিল, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিলেন। অতএব এই দুরাত্মা আজ আর আমার ক্ষমার যোগ্য নহে।

শিশুপাল, যে তেজের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ভগবান প্রথমেই তাঁহার সেই তেজ হরণ করিয়া লইলেন এবং জগৎকে দেখাইলেন, মানুষ যে শক্তি ও তেজের গর্ব্ব করে, তাহা মানুষের নহে। শিশুপাল নিস্তেজ হইয়াও মুখের দর্প ছাড়িলেন না। তখন ভগবান সুদর্শন

চক্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। দর্প ও অহঙ্কারের সহিত শিশুপালের জীবন অন্ত হইল।

শিশুপালকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া, তাঁহার পক্ষীয় রাজগণ উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আর কোন গোল রহিল না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। যজ্ঞান্তে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ মহাসমারোহে সমাপ্ত করিলেন। পাণ্ডবদিগের যশঃ-সৌরভ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেখিয়া, দুর্য্যোধনের প্রাণ, ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্য নষ্ট করিবার জন্য, নানা প্রকারে চেষ্টা পাইয়া, অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। কপট ক্রীড়ায় পড়িয়া যুধিষ্ঠির প্রতিবারেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। তিনি খেলায় যথাসর্ব্বস্ব হারিলেন, শেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত হারিলেন।

দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবদিগের এখন আর কোন স্বত্ব রহিল না। দুর্য্যোধন প্রফুল্লমনে ভ্রাতা দুঃশাসনের প্রতি আদেশ করিলেন, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীকে আনিয়া দ্যূত সভায় উপস্থিত কর। পাণ্ডবেরা বিমর্ষভাবে সভার একপার্শ্বে বসিয়া আছেন, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া অন্তরে দগ্ধ

হইতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন চলিলেন,—যেমন দেবতা তেমনি তার বাহন, তিনি অন্তঃপুর হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়া দ্রৌপদীকে কুরুসভায় উপস্থিত করিলেন। দ্রৌপদী কত কাকুতি মিনতি করিয়াছেন, আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, কান্দিয়াছেন, কিছুতেই পাষণ্ডের দয়া হয় নাই,—তাঁহাকে ছাড়িয়া আসে নাই।

দ্রৌপদী অপমান, লজ্জা ও ভয়ে ম্রিয়মাণা হইয়া কদলী পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছেন, চক্ষের জলে বসন ভিজাইতেছেন, দুঃশাসন চুলের গুচ্ছ ধরিয়া রহিয়াছেন, দ্রৌপদী এই অবস্থায় সভামধ্যে দণ্ডায়মানা। ভীষ্মের ন্যায় ধার্ম্মিক ও বীর চূড়ামণিগণ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট, দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবেরা আস্ফালন করিতেছেন। দেখিয়া, দুঃখে ও ক্ষোভে দ্রৌপদীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

দ্রৌপদী নিরুপায় ভাবিয়া মনের ক্ষোভে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন; বুঝিলাম, ক্ষত্রিয়-চরিত্র, একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে; ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতিরও সারত্ব গিয়াছে, দুঃখিনীর প্রতি কাহারও দয়া হইল না, কৌরব-কৃত এই দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে, কাহারও সাহসে কুলাইল না, পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। দ্রৌপদীর খেদোক্তি শুনিয়া দুঃশাসনের আরও রাগ বাড়িল। তিনি এবার চুল ছাড়িয়া, পরিহিত বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তীব্র বাক্যবাণে দ্রৌপদীর অন্তর ভেদ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন বিদ্রূপ করিয়া, স্বীয়

উরুদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক, দ্রৌপদীকে তথায় বসিতে বলিলেন। দ্রৌপদীর মর্ম্ম বেদনার একশেষ হইতে লাগিল।

দুঃশাসন বস্ত্র ধরিয়া টানিতেছেন। কুলললনা রাজ-কন্যা রাজবধূ দ্রৌপদীকে সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা; তথাপি ক্ষত্রিয়গণ কথা কহিতেছেন না, চিত্র পুত্তলির ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই মহাপাপের জন্যই বুঝি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাগ্নিতে বিধাতা সকলকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন।

দ্রৌপদী দেখিলেন, ভীষ্মাদি গুরুজনের আশা করা বৃথা। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধ নেত্রে, কাতরকণ্ঠে, সেই অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপন্নের বন্ধু মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অনাথ-নাথ পতিতপাবন দীনবন্ধু! আজ কুরুকুলাঙ্গারের হাতে পড়িয়া মান যায়, প্রাণ যায়,—রক্ষা কর। হে গোপীবল্লভ! অসময়ে তোমা ভিন্ন আর কেহ নাই,—উদ্ধার কর। হে রমানাথ! তুমি অন্তর্যামী, অন্তরের যাতনা সকলই জানিতেছ, আর ত সহ্য করিতে পারি না,—অধিনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। হে জনার্দ্দন! দুঃখিনীর ভাগ্যে আজ সকলই বিপরীত; পাণ্ডবদিগের বলবুদ্ধি গিয়াছে, ভীষ্ম বুকে পাষাণ বান্ধিয়াছেন, বিদুরের ধর্ম্ম-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তুমি ভিন্ন, দুঃখিনীর আর কেহ নাই,—লজ্জা রাখ, প্রাণ রাখ।

দ্রৌপদী একমনে, কাতর প্রাণে এইরূপে ভগবানকে ডাকিয়া অধোমুখী হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিলেন। নিজের মলিন মুখ দেখাইতে এবং নির্দ্দয়

কাপুরুষ গুরুজনদিগের মুখ দেখিতে বুঝি, আর তাঁহার ইচ্ছা রহিল না।

দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা ভগবানের নিকট পঁহুছিল। তিনি ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া, দ্বারকা হইতে হস্তি ... খে রওনা হইলেন। এদিকে তাঁহার ইচ্ছায় ধর্ম্ম, দ্রৌপদী... রক্ষা করিলেন। পাপিষ্ঠ দুঃশাসন বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বিবসনা করিতে পারিলেন না। সতী নারীর ধর্ম্ম বলের নিকট, দুরাত্মার আসুরিক বল পরাভূত হইল।

ধর্ম্মের অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া পাপাচারী পুত্রদিগের কার্য্যের জন্য অন্ধ রাজের মনে আশঙ্কা জন্মিল। তখন তিনি দ্রৌপদীকে বলিলেন মা! তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থ... । দ্রৌপদী বলিলেন, কুরুরাজ! যদি অধিনীর প্রতি দয়া হইয়া থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তথাস্তু। দ্রৌপদীর জন্য পাণ্ডবেরা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, পাঞ্চালীসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠির অনিচ্ছা সত্তেও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনের আহ্বান অবহেলা করিতে পারিলেন না। দ্যূত ক্রীড়ায় এবারও হারিলেন, এবং খেলার পণানুসারে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করিলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। এই দীর্ঘ কালের জন্য তাঁহারা মাতা

কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রাখিয়া কাঙ্গালের বেশে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া নগরবাসীরা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল।

ভগবানের একি লীলা? অসাধুর বিপদ হয়, চৈতন্য জন্মাইয়া তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করিতে, তাহা বুঝি। কিন্তু সাধুর বিপদ হয় কেন?—ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগের বিপদ হইল কেন? হায়, ভ্রান্ত আমরা ভগবানের লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব! বুঝিতে পারি না বলিয়া, আমরা অনেক সময়ে, তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্যে দোষারোপ করি।—সাধুর বিপদ হয়, সাধুকে ধর্ম্মে অধিকতর নিষ্ঠাবান্ করিতে। ঝড়ে যেমন বৃক্ষকে দৃঢ় করে, বিপদ তেমনি সাধুকে সৎকার্য্যে সবল করে। সাধু, বিপদে বিচলিত হন না। তিনি জানেন, এই পৃথিবীই মানবের যথাসর্ব্বস্ব নহে। ইহা অপেক্ষা তাঁহাকে অন্য এক উৎকৃষ্ট ভুবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বিপদের প্রবল আঘাতেও ধর্ম্মনিষ্ঠা স্থির ছিল বলিয়া, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গ গমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দুর্ব্বাসার ভোজন।

পাশায় হারিয়া পাণ্ডবেরা কাঙ্গাল বেশে দ্রৌপদীর সহিত বনে গমন করিলেন। কাঙ্গালের সখা শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থায় তিন বার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ বার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং

প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করা, দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্য দুর্ব্বাসার ভোজন উপলক্ষে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা।

দুর্ব্বাসা ঋষি হইলেও বড় ক্রুদ্ধ স্বভাব। অল্প ত্রুটিতেই লোকের উপর রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন এবং অভিসম্পাত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেন। তাঁহার সাধনার জোর বেশী থাকিলেও এই বিষয়ে চরিত্রের দুর্ব্বলতা ছিল। অভি-সম্পাতে তপস্বীদিগের তপঃ ক্ষয় হয়। এজন্য দুর্ব্বাসা তপস্যার অনুরূপ ফল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, বোধ হয় না।*

এই দুর্ব্বাসা মুনি একদিন ষষ্টিসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে হস্তিনায় দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করেন। দুর্য্যোধন আদর অভ্যর্থনা যত্ন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করিলে, মুনি তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পাণ্ডবদিগের বিনাশ

* পুরাণে দুর্ব্বাসা মুনির সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে, তাহা এই,—একদিন এক অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধব্রাহ্মণ ক্ষুধাতুর হইয়া সন্ধ্যার সময় দুর্ব্বাসার আশ্রমে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া, দুর্ব্বাসা তাঁহার সায়ংসন্ধ্যার আয়োজনের সঙ্গে খাদ্য ফলমূলাদিও সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিলেন। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা না করিয়াই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ব্বাসা তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। তখন ভগবান দেখা দিয়া দুর্ব্বাসাকে বলিলেন, এই বৃদ্ধকে আমি আশী বৎসর ক্ষমা করিতেছি, আর তুমি একদিন ক্ষমা করিতে পারিলে না? যাবৎ তুমি ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিবে, তাবৎ তোমার তপস্যার ফল হইবে না।

সাধনই দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য; এজন্য তিনি প্রার্থনা করিলেন, মুনিবর! আপনি এই শিষ্যগণসহ বনে গিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমি এই বর চাই। দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াও দুর্ব্বাসা বলিলেন, তথাস্তু।

দুর্য্যোধনের প্রার্থনানুসারে দুর্ব্বাসা হস্তিনা হইতে বনাভিমুখে পাণ্ডবদিগের নিকট যাত্রা করিলেন। বেলা অবসান সময়ে তিনি সশিষ্য পাণ্ডব-কুটীরে উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরা ব্যস্ত হইয়া পাদ্য অর্ঘ দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। মুনি ক্ষুৎপিপাসারজন্য কাতরতা জানাইয়া, শীঘ্র আহারের উদ্যোগ করিতে বলিলেন এবং তিনি শিষ্যগণের সহিত স্নান ও আহ্নিক করিতে চলিলেন।

পাণ্ডবেরা বনবাসী, নিত্য আনেন, নিত্য খান। একে কিছুরই সংস্থান নাই, তাহাতে দুই একটী লোকের আহার নয়, ষাইট হাজার লোককে আহার করাইতে হইবে, না পারিলে, দুর্ব্বাসার কোপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। এই বিষম ভাবনায় পড়িয়া পাণ্ডবেরা অস্থির হইলেন। দ্রৌপদী বিষণ্ণ বদনে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, সকলে এক মনে বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের প্রাণের ডাকে ভগবান স্থির থাকিতে পারিলেন না। দেবী রুক্মিণী পরিচর্য্যা করিতেছিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, আমি চলিলাম। রুক্মিণী বলিলেন, কোথায়? ভগবান বলিলেন, বনমধ্যে আমার পাণ্ডব সখারা বিপদে পড়িয়া আমাকে স্মরণ করিতেছেন; আমি আর এখানে স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে, দ্বারকা হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনে পাণ্ডবেরা ভরসান্বিত হইয়া ভাবিলেন, বিপদোদ্ধারের এখন একটা উপায় হইবে, আর আমাদের চিন্তা নাই। তাঁহারা কাতর ভাবে হৃষীকেশের নিকট বিপদের বিবরণ জানাইলেন। তিনি বলিলেন, সে যাহা হয় হইবে; এখন আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহার উপায় কি? দ্রৌপদীর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইতে তোমায় ডাকিয়াছি, এখন তোমাকে খাওয়াইবার জন্য কাহারে ডাকিব? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ও কথা রাখিয়া এখন হাঁড়ি অনুসন্ধান কর। যাহা থাকে তাহাতেই আমার তৃপ্তি হইবে। দ্রৌপদী সহাস্য মুখে উঠিয়া, ধোয়া হাঁড়ি আনিয়া দেখাইলেন। কেশব বলিলেন, ঐ যে শাকের কণা লাগিয়া রহিয়াছে, উহাই দাও। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিতেছেন মনে করিয়া দ্রৌপদী তাহাই করিলেন। ভগবান শাকের কণা মুখে দিয়া বলিলেন,—আঃ তৃপ্ত হইলাম। দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এত অপর্য্যাপ্ত আহারেও তৃপ্তি হইবে না? ভগবান বলিলেন, তুমি জাননা, তোমার ঐ শাকের কণা দেবদুর্লভ। দ্রৌপদী বলিলেন, তোমার যেন উদর পূর্ণ হইল, এখন দুর্ব্বাসার উদর পূরণের উপায় কর। যুধিষ্ঠিরাদিও বলিলেন, আমরা সেই ভাবনায় বড় অস্থির হইয়াছি, তাহার ব্যবস্থা কি? কৃষ্ণ বলিলেন, আর সে চিন্তা করিতে হইবে না। তাঁহাদের উদর ছাপাইয়া গলায় গলায় হইয়াছে; আর তাঁহারা এখানে আসিবেন না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যুধিষ্ঠির

আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তুমি পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবদিগের বিপদ, তোমারই বিপদ, আমরা তোমার ভরসাতেই নিশ্চিন্ত হইলাম।

এদিকে দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণ স্নান আহ্নিক অন্তে দেখেন, উদর পরিপূর্ণ, আহারে প্রবৃত্তি নাই, উদ্গার উঠিতেছে, যেন কত কি খাইয়াছেন। দুর্ব্বাসা শিষ্যদিগকে বলিলেন, আহারার্থ যাইব কি, ক্ষুধা মাত্র নাই; জলটুকু পান করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। শিষ্যেরা বলিলেন, আমাদেরও সেই অবস্থা। মুনি বলিলেন, তবে আর পাণ্ডব কুটীরে গিয়া কাজ নাই। চল, আমরা আমাদের আশ্রমের দিকে যাই। এই বলিয়া তিনি সশিষ্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

এই প্রকারে পাণ্ডবদিগের বিপদ কাটিল, দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টা বিফল হইল। ভগবানের অনন্ত কৌশল, অসাধারণ স্থলেই তাঁহার অসাধারণ ব্যবস্থা। ভক্তের বিপদকে তিনি নিজের বিপদ মনে করেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

অভিমন্যুর বিবাহ।

পাণ্ডবেরা বারবৎসর বহুকষ্টে বনে বনে কাটাইলেন। শেষে অজ্ঞাত বাসের বৎসর বিরাট রাজার পুরীতে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিলেন। তাহাও কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়া গেল। এই সময়ে

কৌরবেরা বিরাট ভূপতির গোধন হরণ করেন। অর্জ্জুন, রাজ-পুত্র উত্তরকে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ সঙ্গে লইয়া একাই কৌরব দিগকে পরাজয় পূর্ব্বক গোধন উদ্ধার করিলেন। ইহার পরই তাঁহারা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক প্রকাশিত হইলেন। পাণ্ডবদিগের সমাচার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। বিরাট রাজা প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, মহাসমা-দরে পাণ্ডবদিগের সংবর্দ্ধনা করিলেন, এবং গোধন রক্ষাদি পাণ্ডবকৃত উপকার উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যগ্রতা জানাইলেন। রাজকুমারী উত্তরার সহিত অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল।

যুধিষ্ঠির, অভিমন্যুর বিবাহের সমাচার জানাইয়া, কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য যাদব দিগকে আনায়ন জন্য দ্বারকায় দূত প্রেরণ করি-লেন। দ্রুপদ রাজার নিকটেও সংবাদ গেল। নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে বিরাট রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। অভিমন্যু তৎকালে অনার্ত্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ অনুসারে কৃষ্ণ বলরাম তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, সমারোহ পূর্ব্বক অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল।

পাণ্ডবদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন্ত্রণা।

অভিমন্যুর বিবাহোৎসব শেষ হইলে,একদিন পাণ্ডবের, সমাগত আত্মীয়গণের সহিত বিরাট সভায় উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, নৃপতিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, " সত্যপালন হইল, অতঃপর পাণ্ডবদিগের কর্ত্তব্য কি? আপনারা চিন্তা করিয়া তাহা স্থির করুন। যাঁহারা সত্যের অনুরোধে এত কষ্ট সহ্য করিলেন, অধর্ম্ম করিয়া স্বর্গরাজ্যলাভও তাঁহাদের প্রার্থনীয় নহে। অধার্ম্মিক কৌরবেরা বাল্যকাল হইতে ইঁহাদিগকে কত কষ্ট দিয়াছে ও বিপদে ফেলিয়াছে, তথাপি ইঁহারা তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। অতএব উভয় পক্ষের হিতকর চিন্তাদ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন, "দুর্য্যোধন ইঁহাদের প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য সহজে ছাড়িয়া দিবেন, কি যুদ্ধ অবলম্বন করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যাহাতে তিনি সন্ধি করেন এবং ইঁহাদের প্রাপ্যরাজ্য ইঁহাদিগকে দেন, তাহা বুঝাইবার জন্য কোন ধার্ম্মিক সুযোগ্য দূতকে তাঁহার নিকট পাঠান উচিত কি না, আপনারা তাহাও ভাবুন।" শ্রীকৃষ্ণের কথা সমাপ্ত হইলে, বলরাম বলিলেন, " সন্ধি হইলেই সর্ব্বপ্রকারে ভাল হয়। অতএব সেইজন্য উপযুক্ত দূত পাঠান উচিত।" সাত্যকি বলিলেন, " সন্ধি হয় হউক, কিন্তু আমার মতে পাপিষ্ঠদিগকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।" দ্রুপদ রাজা বলিলেন, " সন্ধির জন্য দূত প্রেরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু হবেনা নিশ্চয়। আমার মতে দূতও পাঠান

হউক, এদিকে মিত্ররাজগণের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা হউক। সন্ধি হয় ভাল, না হয় কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকিবে।” সকলের কথা সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ শেষে বিশেষ কিছু না বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে এইমাত্র জানাইয়া রাখিলেন যে, “সন্ধি না হইলে, অগ্রে অন্য সকলের নিকট দূত পাঠাইয়া সর্ব্বশেষে আমাদিগকে আহ্বান করিবেন।” এইরূপ বলিয়া কহিয়া তিনি যাদবদিগকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

যুদ্ধের উদ্যোগ।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলে, পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজার পরামর্শানুসারে দুর্য্যোধনের নিকট দূত পাঠানের পূর্ব্বেই রাজাদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে স্বপক্ষীয় করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন ইহা জানিতে পারিয়া, তিনিও চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকে স্বপক্ষ করিবার জন্য উভয় পক্ষেরই চেষ্টা; ঐ অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন একই সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। দুর্য্যোধন শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বাসুদেবের শীর্ষদেশস্থিত আসনে উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুন পশ্চাতে গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জাগ্রত হইয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে, পরে দুর্য্যোধনকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়া উভয়ের নিকট

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আগমনের হেতু জানিতে চাহিলেন। তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইবে,আপনাকে কৌরব পক্ষে সাহায্যকারী রূপে থাকার প্রার্থনা জানাইবার জন্য আমি আসিয়াছি। উভয় পক্ষের সহিতই আপনার তুল্য সম্বন্ধ, কিন্তু আমি প্রথমে আসিয়াছি বলিয়া, অগ্রে আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিতে হইবে।

দুর্য্যোধনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনি আগে আসিয়াছেন,তাহাতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু অর্জ্জুন প্রথমে আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছেন। আমি উভয় পক্ষেরই সাহায্য করিব। এক পক্ষে আমার তুল্য যোদ্ধা, অর্ব্বুদ সংখ্যক আমার নারায়ণী সৈন্য থাকিবে, অন্য পক্ষে যুদ্ধ-বিমুখ ও নিরস্ত্র হইয়া আমি থাকিব; আপনারা কে কি চান? কিন্তু ধর্ম্ম ও প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে বয়সে কনিষ্ঠ বলিয়া অগ্রে অর্জ্জুনের বরণ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব প্রথমে অর্জ্জুন বলুন কি চান? অর্জ্জুন বলিলেন, আমি আপনাকে চাই। তখন কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন, তাহাহইলে, আপনি নারায়ণী সৈন্য গ্রহণ করুন। দুর্য্যোধন সম্মত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, যুদ্ধ-বিমুখ নিরস্ত্র কৃষ্ণ অপেক্ষা নারায়ণী সৈন্য, আমার পক্ষে ভালই হইল। তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বে হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন।

দুর্য্যোধন গমন করিলে পর, ভগবান অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন? যুদ্ধ-বিমুখ নিরস্ত্র আমাকে লইয়া তুমি কি করিবে? অর্জ্জুন বলিলেন,

আপনাকে লইয়াই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। কৃষ্ণ বলিলেন, আমাদ্বারা কি কাজ হইবে? অর্জ্জুন বলিলেন, আপনাকে আমার রথের সারথি করিব। ভগবান মনে মনে হাসিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর অর্জ্জুন কয়েক দিন দ্বারকায় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম ও ন্যায় সঙ্গত রূপে উভয় পক্ষের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। প্রবৃত্তি অনুসারে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইল। দুর্য্যোধন আসুরিক বলে জয়লাভের ইচ্ছুক, তিনি সৈন্যবলের সাহায্য প্রাপ্তির কথায় সন্তুষ্ট হইলেন; পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ, ধর্ম্ম সঙ্গত, অর্জ্জুন ধর্ম্মাবতার কৃষ্ণকে লাভ করিয়া সুখী হইলেন। তথাপি লোকে কিরূপে বলে যে, কৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়া, পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

পাণ্ডব ও কৌরব দূতগণ।

কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা সন্ধির চেষ্টাও পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা সন্ধির জন্য দ্রুপদ রাজার পুরোহিতকে দূতরূপে কৌরব সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি হস্তিনায় গিয়া দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু ফল হইল না। দুর্য্যোধন স্পষ্ট বলিলেন, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিব না। দূত অকৃতকার্য্য হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রতিগমন পূর্ব্বক সকল কথা জানাইলেন।

অন্ধরাজ, কুপুত্র দুর্য্যোধনের বাধ্য হইয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা নাই, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে যে, কৌরব পক্ষের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সে ভয়ও তাঁহার আছে। অতুল বাহুবলশালী ভীমকে তাঁহার বড় ভয়, এবং পুরুষোত্তম কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আর এক মহা ভয়। তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ অমাত্য সঞ্জয়কে দূতরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। অভিপ্রায়,—ধর্ম্মভয় দেখাইয়া যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে ক্ষান্ত করা।

সঞ্জয় বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক যুদ্ধের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া ধর্ম্মভীরু যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে নিরস্ত হইবার জন্য, অনেক কথা বলিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, দুর্য্যোধনের অন্যায় আচরণেই যুদ্ধ বাধিবার সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। কৃষ্ণও বলিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অর্থলোভী পুত্রগণের জন্যই যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে, অতএব এবিষয়ে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। কৃষ্ণ আরও বলিলেন, আমি নিজে একবার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া, সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দেখিব, তাহাতেও যদি পাণ্ডবদিগের যথার্থ প্রাপ্য রাজ্য দিতে সম্মত না হন, তবে কৌরবদিগের ধ্বংস অনিবার্য্য।

সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া অন্ধরাজকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তাহা লইয়া কৌরবদিগের মধ্যে বিশেষ আলোচনা হইল। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, রাজ্যার্দ্ধ দিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। দুর্য্যোধনের

তাহাতে মত হইল না। ভীষ্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহাও বিফল হইল।

এদিকে পাণ্ডবপক্ষ হইতে দূতরূপে ভগবান স্বয়ং কৌরব সভায় যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে শত্রু পক্ষীয় ভাবিয়া পাছে, দুর্য্যোধন তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, এজন্য যুধিষ্ঠির একটু ইতস্ততঃ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, ভয় নাই, তাহারা আমার কি অনিষ্ট করিতে পারে? তবে যাওয়ায় কোন ফল হইবে না, তাহা আমি জানি। তথাপি লৌকিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি রাখা উচিত নহে। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির আর আপত্তি করিলেন না। ভগবান পাণ্ডবদিগের দূত হইয়া হাস্তনায় যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম প্রভৃতি অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন; আলাপ সম্ভাষণ ভিন্ন অন্য কোন কথা হইল না। হৃষীকেশ সভা হইতে বহির্গত হইয়া বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। বিদুর ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পাণ্ডবদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসিলেন, কুন্তীদেবীও কান্দিতে কান্দিতে আসিয়া পুত্রদিগের অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সকলের মঙ্গল সমাচার জানাইয়া বলিলেন, আপনি কান্দিবেন না, পাণ্ডবদিগের সুখ-সৌভাগ্যের দিন নিকটবর্ত্তী।

বিদুরের ভবন হইতে ভগবান পুনরায় কৌরব সভায় গমন করিলেন। এবারও অন্যান্য নানা কথায় গত হইল, আসল কথা পাড়িলেন না। দুর্য্যোধন বাসুদেবকে ভোজনের নিমন্ত্রণ

করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, আমি পাণ্ডব পক্ষ হইতে দূত হইয়া আসিয়াছি, কার্য্যসাধনের পূর্ব্বে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না। ভগবান দুর্য্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া, সে দিন কাঙ্গাল বিদুরের গৃহে গিয়া শাকান্ন ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিলেন।

পরদিন পুনরায় কৌরব সভায় আগমন পূর্ব্বক, ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কুরুরাজ! আমি পাণ্ডব ও কৌরবদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আসিয়াছি। নীতি ও ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। অতএব, আমি আপনাকে আর বেশী কি বলিব। আপনি আপনার বিষয়লোভী পুত্রদিগকে সদুপদেশ দ্বারা অধর্ম্মাচরণে বিরত করুন। ইহাতে উপেক্ষা করিলে, প্রলয় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, কুরুকুল বিনষ্ট হইবে, পৃথিবীর বীর বংশ ধ্বংস হইবে। অতএব আপনি আপনার পুত্রদিগকে বুঝাইয়া সুপথে আনুন, আমি পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিব। রাজন্! সন্ধি না হইলে, আপনি শান্তি পাইবেন না, আপনার ধর্ম্মচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরাও ত আপনার পর নয়। তাঁহাদের অনিষ্ট হইলে তাহাতেও আপনার দুঃখ হইবে। পাণ্ডবেরা বিনীত বাক্যে আপনাকে জানাইয়াছেন যে, প্রাপ্য রাজ্য দিয়া তাঁহাদের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করুন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক, কৃষ্ণকে এবং পাণ্ডবদিগকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, কেশব!

আমি কি করিব, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আমার বাধ্য নহে। তুমি তাহাকে বুঝাইতে যত্ন কর।

তখন কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন, আপনি আমার কথা শুনিয়া পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। সন্ধি করিতে সভাসদ্গণের ও আপনার পিতার, সকলেরই ইচ্ছা। অতএব আপনি ইহাতে সম্মত হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করুন; তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে আপনার মঙ্গল হইবে। দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ শুনিবেন না। কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের মত ফিরিল না। ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি একে একে বুঝাইলেন, কিছুতেই দুর্য্যোধনের মন নরম হইল না।

অবশেষে গান্ধারী কুপিতা হইয়া বলিলেন, কুলাঙ্গার! তুই গুরুজনের হিত কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছিস্। বুঝিলাম, তোর পাপেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। মাতার এই বাক্যে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, দুর্য্যোধনকে বান্ধিয়া আপনি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন, নতুবা মঙ্গল নাই। কৃষ্ণের এ উপদেশ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধরিল না।

দুর্য্যোধন সভা হইতে বহির্গত হইয়া কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি কুমন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। সাত্যকি তাঁহাদের এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, কৃষ্ণকে চুপে চুপে সে কথা জানাইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে তাহা সভামধ্যে প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া, বিদুর কহিলেন, কৌরবদিগের মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, তাই দুর্য্যোধনের এমন

দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে, একাই সকলের বলদর্প ঘুচাইতে পারি, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা নাই, দুর্য্যোধন যাহা পারেন করুন। তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সভায় ডাকাইয়া অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন, বিদুরও গালাগালি দিলেন।

দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টা ভাবিয়া, শ্রীকৃষ্ণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বহির্গত হইয়া, নৃপতিগণের চক্ষু ঝলসিয়া ফেলিল। তাঁহারা সেই তেজোময় মূর্ত্তি দর্শনে অসমর্থ হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। ভগবানের কৃপায় কেবল সভাস্থ ঋষিগণ, আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় দৃষ্টি রক্ষণে সমর্থ হইলেন। তাঁহারা অতঃপর ভগবানের বিশ্বরূপ ধারণ পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া মোহিত ও চরিতার্থ হইলেন। ভগবান, বিশ্বরূপ সংবরণ পূর্ব্বক আর অপেক্ষা করিলেন না। ঋষিগণের অনুমতি লইয়া, সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার সহিত সভা হইতে বহির্গত হইলেন।

তিনি বিদুরের আশ্রমে গিয়া কুন্তীকে অভিবাদন ও সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক রথারোহণে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রস্থান করিলেন। গমন কালে তিনি কর্ণকে রথে উঠাইয়া কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া, তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষ আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ণ যে কুন্তীর কানীন পুত্র এবং যুধিষ্ঠিরাদির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতরাং তিনিই রাজা হইবেন, একথা তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষ

পরিত্যাগ করিলে, দুর্য্যোধন সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহাহইলে, কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে, মঙ্গলময় ভগবান সমস্ত কথাই কর্ণকে খুলিয়া বলিলেন। কর্ণ তাঁহার যুক্তিযুক্ত কথাগুলি স্বীকারও করিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি কতকগুলি কারণের জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান আর কিছু না বলিয়া, কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রথ চালাইয়া পাণ্ডবদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের একান্তই বিনাশ দশা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ অনিবার্য্য, অতএব যুদ্ধের আয়োজন করুন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসজ্জা।

সন্ধির চেষ্টা সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইলে, পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণরূপে হইতে লাগিল। দুর্য্যোধনও প্রচুর বল সংগ্রহ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত ও কৌরব পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইল। দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডব সেনার অধিনায়ক হইলেন। কৌরব পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যুদ্ধের জন্য এই সকল

নিয়ম ধার্য্য হইল যে, প্রতিদিন দিবাবসানে যুদ্ধের অবসান হইবে। যুদ্ধের সময় ভিন্ন, অন্য সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রু ভাব থাকিবে না। অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত এবং রথী রথীর সহিত ও পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবে। সমযোদ্ধা ভিন্ন সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল। সৈন্য ও সেনাপতিগণ সজ্জিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্য মধ্য হইতে উল্লাস সূচক শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের ভীমনাদী পাঞ্চজন্যশঙ্খও বাজিল। রণসজ্জায় কুরুক্ষেত্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

ভগবদ্গীতা।

কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য সজ্জিত হইলে, অর্জ্জুন বলিলেন, হৃষীকেশ! একবার উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর; দুর্য্যোধনের পক্ষে যে সকল যোদ্ধৃবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে একবার দেখিব। পার্থের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। রথ উভয় পক্ষের সৈন্যমধ্যে স্থাপিত হইলে, পার্থ সমস্ত সেনা এবং সেনাধ্যক্ষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন। এ যে, সকলই আমার;—আমার

পিতামহ, আমার আচার্য্য, আমার ভ্রাতা, আমার জ্ঞাতি, আমার কুটুম্ব, সকলই যে আমার। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে নিধন করিয়া, আমাদিগকে রাজ্যলাভ করিতে হইবে? তবেই হইয়াছে! সে রাজ্যে আমাদের কাজ নাই, বরং ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, তথাচ যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে নিধন করিতে পারিব না। দয়ায় ও মমতায় অর্জ্জুনের শরীর অবসন্ন হইল, হাতের গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল, তিনি দুর্য্যোধনের সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গেলেন।

এই ভীষণ সময়ে অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য বিমুখ দেখিয়া, ভগবান তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! তোমার ন্যায় ব্যক্তির এরূপ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য ও মোহ শোভা পায় না। এই কর্ত্তব্য-বিমুখতায় তোমার ইহকাল, পরকাল দুই-ই নষ্ট হইবে। অতএব মোহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। অর্জ্জুন বলিলেন, কেশব! যে যুদ্ধে জ্ঞাতি ও গুরুগণের রক্তপাত করিতে হইবে, সে যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ফল দেখি না। যাহাহউক তুমি শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া আমাকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দাও।*

তখন ভগবান হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, সখে! তুমি পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছ কিন্তু কার্য্যে সেরূপ করিতেছ না। অতএব তোমাকে প্রথমে পণ্ডিতের মতে কর্ত্তব্য

---

* এই সময়ে ভগবান অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পালন জন্য যে উপদেশ দিয়া ছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ। গীতার কতকগুলি উপদেশ সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

বুঝাইতেছি। অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা জীবিত বা মৃত কাহারও জন্য শোক করেন না। আমি, তুমি, আর এই সকল রাজন্যগণ, এখন যেমন বর্ত্তমান আছি, পূর্ব্বেও তেমনি ছিলাম এবং পরেও থাকিব। এই সকলের দেহের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন, তিনি নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বকাল স্থায়ী; কিছুতেই তাঁহার বিনাশ নাই। জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি যাহা দেখ, তাহা এই দেহেরই হয়। একের আত্মা অন্যের আত্মাকে ধ্বংস করিতে পারেন বলিয়া যিনি ভাবেন, আত্মা কি পদার্থ, তাহা তিনি জানেন না। আত্মার জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি কিছুই নাই। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না। মনুষ্য যেমন জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন-দেহ আশ্রয় করেন। আত্মা, শস্ত্রে বিদ্ধ হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে দ্রব হন না। অতএব কিরূপে তুমি এই সকল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিবে? তুমি আত্মার স্বরূপ বুঝিয়া শোক পরিত্যাগ কর, কর্ত্তব্য বিমুখ হইও না।

আর যদি দেহের ন্যায় আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে, এইরূপই মনে ভাব, তাহাহইলেও তোমার শোক করা উচিত নহে। কারণ, জন্মিলেই মরিতে হইবে, বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় হইবে, ইহা প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়ম। অতএব এই অবধারিত বিষয়ের জন্যও তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য।

অতঃপর ভগবান উচ্চ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া সংসারী মতে অর্জ্জুনকে বুঝাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয়; ধর্ম্মযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব কর্ত্তব্য বিমুখ হইলে, এই

হিসাবেও তোমাকে নিন্দনীয় ও পাপী হইতে হইবে। তুমি আমার কথানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, লাভালাভ ভাবিও না।

অর্জ্জুন! কার্য্য করিতেই তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কার্য্যফলে তোমার কোন অধিকার নাই। ফলদাতা ঈশ্বর। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম করিতেছি মনে করিয়া, কামনা শূন্য হইয়া কার্য্য করেন। তাহাতে ফল হউক বা না হউক তজ্জন্য ক্ষতিবৃদ্ধি বিবেচনা করেন না। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মই* শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্ম্মের আর একটী মহৎ ফল এই,—কার্য্যে সফলতা লাভ না হইলেও তাহাতে মর্ম্মবেদনা জন্মে না। ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে, তাহাদিগকে বিষম মর্ম্ম পীড়া ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া গেলে, তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় নিষ্কাম কর্ম্মকারীর কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়। তখন আত্ম জ্ঞান জন্মে, সুতরাং সে সময়ে লোকে আত্মার সহিত দেহের যে পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারে। আত্মজ্ঞান জন্মিলেই বুদ্ধি, আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থে আসক্ত থাকিতে পারে না। সেসময়ে ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধি অবিচলিত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই তত্ত্বজ্ঞানী

* ভগবান যে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল নিজের সম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে বা জগতের সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিবে, তাহাতে নিজে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। উহাতে অপরের হিত বা জগতের হিত প্রার্থনা থাকিলে অথবা ঈশ্বরের প্রীতি সাধন অভিপ্রেত হইলে, নিষ্কামত্বের বাধা হয় না। তদ্রূপ কার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণনীয়।

ব্যক্তিরা যোগী বা জীবন্মুক্ত পুরুষ। তাঁহাদের মন আত্মা তেই পরিতৃপ্ত থাকে বলিয়া দুঃখে বিহ্বল বা সুখের জন্য লালায়িত হয় না। ঐ যোগীদিগের কোন প্রকার বিষয়াসক্তি, মায়া মমতা, অথবা রাগ দ্বেষ প্রভৃতি থাকে না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে। সর্ব্বকাম পরাজিত না করিয়া সংসার ত্যাগী হইলে, যোগী হওয়া যায় না।

অর্জ্জুন বলিলেন, কেশব! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। যদি জ্ঞানই নিষ্কাম-কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য উত্তেজনা করিতেছ কেন? তুমি কথনও জ্ঞানের, কথনও কর্ম্মের প্রশংসা করিলে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, তাহা বিশেষ করিয়া বল, আমি তাহাই অবলম্বন করিব।

ভগবান বলিলেন, সখে! জ্ঞান যোগ ও কর্ম্ম যোগ উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। এই উভয়ের দ্বারাই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। কেবল অধিকার ভেদেই বিষয় ভেদ হইয়াছে। যিনি জ্ঞানী, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ, আর যিনি কর্ম্মী, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম যোগ অবলম্বন করাই ভাল। দেহধারী মাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও কর্ম্ম ভিন্ন কথনও জ্ঞান লাভ হয় না। যতদিন চিত্ত-শুদ্ধি না হয়, ততদিন সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে। তাই বলিয়া, সকল কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয় না। যিনি ধনের আশায় কর্ম্ম করেন, তাঁহার ধন হয়, যিনি মানের আশায় কর্ম্ম করেন, তাঁহার মান লাভ হয়; আর যিনি চিত্তশুদ্ধির আশায় নিষ্কাম

হইয়া কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। অতএব সখে! তুমি অগ্রে নিষ্কাম-কর্ম্ম কর। তাহা হইলেই চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে।

যাঁহারা জ্ঞান লাভ না করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাঁহাদের ভোগসুখের আশা মন হইতে যায় না। এইরূপ বাহ্যিক বৈরাগ্য প্রদর্শনকারী সন্ন্যাসীরা কপটাচারী ও প্রতারক। এরূপ বৈরাগ্যে মুক্তিলাভ হয় না। অতএব অর্জ্জুন! যদি তোমার প্রকৃত বৈরাগ্য লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে সর্ব্বদাই কর্ম্ম কর। কর্ম্ম করিতে করিতে বিষয় সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে। কারণ, বিষয় সুখের আস্বাদ গ্রহণ ভিন্ন, তাহার অসারতা বুঝা যায় না। আবার সেই অসারতা বুঝিতে না পারিলে, বিষয় সুখে ঘৃণা জন্মে না, সুতরাং প্রকৃত বৈরাগ্য লাভও হয় না। অতএব তুমি নিষ্কাম মনে কর্ম্ম কর। কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হইও না।

ভগবান পুনরায় কহিলেন, সখে! আমার এই রূপ ভিন্ন আর এক অব্যক্ত রূপ আছে। তাহা কেহ দেখিতে পায় না। আমি সেই অব্যক্ত রূপে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি। সকল ভূতই আমাতে অবস্থিতি করে, আমি কিছুতেই স্থিত নহি। আমি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, এই পঞ্চ ভূতের অন্তরে ও বাহিরে আছি বটে, কিন্তু কাহারও সহিত সংলিপ্ত নহে। বায়ু যেমন আকাশে আছে, ভূত সমস্তও সেইরূপ আমাতে আছে। প্রলয় কালে এই সকল আমাতেই বিলীন হয়। আবার আমার বাসনা হইলে, এই সমুদায়ই উৎপন্ন হয়। এই জড়-চৈতন্যময় জগৎ আমার ইচ্ছাতেই সৃষ্ট হইয়াছে।

আমি উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্ম্মে অনাসক্ত থাকায়, কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হই না। অথচ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি। কর্ম্ম ফলের বাসনা থাকাতেই জীব, জন্মমৃত্যু জরাদি দুঃখ ভোগ করে। আমি কখনও সুরময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হই। পরমার্থ জ্ঞানহীন মনুষ্যেরা আমার মানব-মূর্ত্তিতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ জানিয়া আমার ভজনা, আমার নাম সংকীর্ত্তন ও ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে নমস্কার করেন এবং এক মনে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করেন, কেহ কেহ বা জীবাত্মাকে আমার সহিত অভিন্ন জানিয়া ভজনা করেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন।

বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাম্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, আমার নিকট স্বর্গ কামনা করেন। কর্ম্মফলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়া নানা প্রকার সুখ ভোগের পর, যখন সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হয়, তখন আবার মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করেন। এরূপ লোকদিগের, পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমনের পর শেষে স্থায়ীরূপে স্বর্গ ভোগ হয়। কিন্তু যাঁহারা এক মনে আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই নিষ্ঠাবান্ পুরুষ দিগকে আমি যোগ ও কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকি।

অর্জ্জুন! যাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তি বিশিষ্ট হইয়া, অন্য দেবতার পূজা করে, তাঁহারাও অজ্ঞানতা বশতঃ আমারই পূজা করেন। আমার সহিত অভেদ জ্ঞান না করিয়া, যিনি পৃথক জ্ঞানে অন্য

দেবতার পূজা করেন, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে না পাইয়া সেই সেই দেব লোকে গমন করেন। যাঁহারা আমাকে সর্ব্বময় জ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহারাই আমাকে পান। ইহলোকে কর্ম্ম জনিত ফল, শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া, মানবগণ সকাম হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

আমি সর্ব্ব প্রাণীর পক্ষেই একরূপ; কেহ আমার প্রিয়, বা কেহ অপ্রিয় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, সে আমাতে অবস্থিতি করে। আমি তাহাকে কৃপা করিয়া থাকি। অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করিলে, দুরাচারও শীঘ্র ধার্ম্মিক হয়। আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

আমাকে যে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি এবং সে সেই ভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা প্রেমভক্তির বলে, আমাকে পরমাত্মা রূপে অবগত হইতে পারেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তগণ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

পত্র, পুষ্প, ফল বা সুধু জল, ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যাহা প্রদান করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করি। অতএব অর্জ্জুন! তুমি তোমার কার্য্য, দান, তপস্যা, হোম, আহার প্রভৃতি সমস্ত আমার প্রীতির নিমিত্ত, আমাতে সমর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তুমি নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই রূপ অনেক উপদেশ বাক্য বলিলে, তখন অর্জ্জুন কহিলেন, কেশব! তোমার উপদেশ শুনিয়া

আমার ভ্রমজ্ঞান দূর হইল। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না,—যুদ্ধ করিব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফল।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষের সেনা ও সেনাপতিগণ মহা বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথি হইয়া রথ চালান, আর পরামর্শ দেন,* যুদ্ধ করেন না। আঠার দিন ব্যাপিয়া এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের পরিণাম, বিধাতার যাহা লিখন, তাহাই হইল। পাণ্ডবেরা জয়ী হইলেন। বীর চূড়ামণি ভীষ্ম শর-শয্যাশায়ী রহিলেন। ভারতের বীরবংশ একেবারে ধ্বংস হইল। দুর্য্যোধনাদির বংশে বাতি দিতে কেহ রহিল না। আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হইল। যুদ্ধ শেষে কৌরব পক্ষে রহিলেন কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, পাণ্ডব

---

* দ্রোণ বধের সময় "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।" যুধিষ্ঠিরকে এরূপ কপট ও মিথ্যাকথা বলিতে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ দেন নাই। ধনুকের ছিলায় সর্পভ্রম জন্মাইয়া, অর্জ্জুনকে তাহা কর্ত্তনের পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক দ্রোণ বধের অন্যায় অনুষ্ঠানও ভগবান করেন নাই। ঐ শ্লোকগুলি মূল মহাভারতের নহে। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

পক্ষে রহিলেন, মাত্র যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই। ফলতঃ এমন মহানিষ্টকর ভীষণ যুদ্ধ ভারতে আর কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠির আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবহীন রাজত্ব লাভ করিয়াও সুখী হইলেন না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ।

যুদ্ধ শেষ হইলে, পাণ্ডবগণসহ শ্রীকৃষ্ণ, শোকে সন্তপ্ত ধৃত-রাষ্ট্র, গান্ধারী ও কৌরবপত্নীদিগকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রদর্শনে গমন করিলেন। পতি, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনগণের মৃতদেহ রণভূমে পতিত দেখিয়া, কৌরব রমণীরা বিষম আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। গান্ধারী শত পুত্রের শোকে একেই অভিভূতা ছিলেন, এখন তাঁহাদের মৃত শরীর দর্শন করিয়া শোক-যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতল-শায়িনী হইলেন। চৈতন্য লাভ হইলে, ক্রন্দন করিতে করিতে দারুণ মর্ম্ম বেদনা জানাইয়া কৃষ্ণকে অভিশপ্ত করিলেন। বলি-লেন, "কেশব! তোমার জন্যই এই ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে, তুমি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলে, এই মহানিষ্ট ঘটিতে পারিত না। তুমি তাহা কর নাই, এজন্য, আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি; তোমার অমনোযোগে যেমন আমার বংশ ধ্বংস হইল, তেমনি তোমার দ্বারাই তোমার বংশ ধ্বংস হইবে। আমি যদি কায়-মনোবাক্যে পতি সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই

বাক্য বৃথা হইবে না।" রত্নগর্ভা মাতা পুত্ররত্নদিগের কার্য্য ভাবিলেন না, কৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেবি! আমি যাহা করিব সঙ্কল্প করিয়াছি, তুমি তাহাই বলিলে, তোমার অভিশাপ সফল হইবে।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের স্তব।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে রণক্ষেত্রে পতিত মৃত ব্যক্তিদিগের সৎকার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন করিলেন। পর দিন প্রভাতে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগকে সঙ্গে করিয়া, শরশয্যাশায়ী পরমভক্ত ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রেমভরে ভীষ্মের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন, কেশব! তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তোমার মহিমা বর্ণনা করিয়া দেবগণও শেষ করিতে পারেন না। তোমাকে জানিতে পারিলে, মৃত্যুভয় দূরীভূত হইয়া পরম পদ লাভ হয়। যে তোমাকে ভক্তির সহিত একবার প্রণাম করে, তাহার দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। যে তোমাকে স্মরণ করিয়া শয়ন, ভোজন, গমন প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহার আপদ বিপদ সমস্ত নষ্ট কর। তুমি নরকভয় নিবারক, ভবসাগরের তরণী; গো, ব্রাহ্মণ এবং জগতের হিতকারী। আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। যাবৎ আমার জীবন অন্ত না হয়, তাবৎ শঙ্খ-

চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া আমার জীবন সার্থক কর।

কেশব! যুদ্ধের সময় তোমার ঐ দিব্য শরীর শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি। তুমি ভক্তসখা অর্জ্জুনের জন্য বুক পাতিয়া সকলই সহ্য করিয়াছ। নিজের প্রাকৃতিক দেহের রক্ত দিয়াছ, তবু ভক্তের প্রতি দয়া ছাড়িতে পার নাই। কৃপাসিন্ধু! তোমার অনন্ত কৃপার অন্ত কে করিবে, কে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে? আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমার অন্তিম কালের সুগতি বিধান কর।

ভগবান হৃষীকেশ, ভীষ্মের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও নীতিজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আপনার গুণ-গৌরব, আপনার সঙ্গেই লোপ হইতে চলিল। আমার ইচ্ছা, যুধিষ্ঠিরকে আপনার জ্ঞানের কিছু উপদেশ প্রদান করেন। ভীষ্ম বলিলেন, জনার্দ্দন! ধর্ম্মই বল, আর কর্ম্মই বল, তুমি সকলের মূল। তোমার সাক্ষাতে আমি কি উপদেশ দিব? বিশেষতঃ আমি শরশয্যায় পতিত, মুমূর্ষু এবং ক্লিষ্ট; আমার কি এখন মন স্থির আছে যে, উপদেশ দিব। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনাকে বর দিতেছি, আমার বরে আপনার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। আপনি দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ সকলই বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিবেন। অতএব রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনি উপদেশ প্রদান করুন। আপনাকে সমধিক যশস্বী করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন। ভগবানের কৃপায়

তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণা সমস্ত গেল। তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে বিস্তৃত রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভীষ্মের উপদেশ শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত উপকৃত ও চরিতার্থ হইলেন।

কামগীতা।

ভীষ্ম শরশয্যায় থাকিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলেই, যোগাবলম্বনে মানব লীলা সংবরণ পূর্ব্বক, নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন।

ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার শোকে যুধিষ্ঠির অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনের বিনাশ হেতু তাঁহার মন পূর্ব্বেই বৈরাগ্য যুক্ত হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও রাজত্ব গ্রহণ করিতে প্রথমে সম্মত হন নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। এখন আবার বলিয়া বসিলেন, রাজত্বে আমার প্রয়োজন নাই, আমি বনবাসী হইব। তিনি পিতামহের মৃত্যুকে নিজকৃত কার্য্যের ফল ভাবিয়া এবং তাঁহার স্নেহ মমতা গুণগ্রাম, স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য ব্যাস, নারদ প্রভৃতি আসিয়া অনেক বুঝাইলেন, তাহাতেও তাঁহার বৈরাগ্য গেল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, রাজন্! বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনের বৈষম্য উপস্থিত হইলে, যেমন

শরীরে ব্যাধি জন্মে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ, তম, আত্মার এই তিন গুণের বৈষম্য জন্মিলে, মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক থাকে না, আবার শোকের সময় আনন্দ অনুভব করা যায় না। মনে অহংজ্ঞান উদয় হওয়ায় আপনি শোকাভিভূত হইয়াছেন। কিন্তু এ সময়ে আপনার সুখদুঃখ কিছুই মনে করা উচিত নহে। পরম ব্রহ্মই সুখদুঃখের অতীত, এ সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য। অহংজ্ঞানের সহিত এখন আপনার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অপেক্ষা গুরুতর। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্যাবলম্বন ভিন্ন অহঙ্কারকে পরাজয় করিতে পারিবেন না এবং না পারিলে দুঃখেরও সীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার কথা শুনিয়া, অহংজ্ঞানকে পরাজয় করিয়া শোক দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির মনে রাজত্ব করুন।

রাজন্! কেবল রাজ্য পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হইবে না। বিষয় পরিত্যাগ দূরে থাক্, ইন্দ্রিয় সকলকে পরাজয় করিলেও সিদ্ধিলাভ করা কঠিন। মমতা বিহীন না হইলে, ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে না। যিনি জগতকে অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণীদিগের দেহ নাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। শুধু বনচর হইয়া ফল মূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে কি হইবে; বিষয় বাসনা না গেলে সংসার বন্ধন যায় না। ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়কেই মায়াময় বলিয়া জ্ঞান করুন। কামনা মনে জন্মে, এবং উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যিনি ফললাভের বাসনায় দান, ব্রত,

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি কামনাকে পরাজয় করিতে পারেন না। কামনা নিগ্রহ ভিন্ন, যথার্থ ধর্ম্ম হয় না।

কামনা স্বয়ং বলিয়াছে, “নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ব্যতিরেকে কেহ আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। জাপক, যাজ্ঞিক, বৈদিক, তপস্বী, এই সকলের মনেই আমি অস্ফুটরূপে প্রকাশ পাই।” হে রাজন্! আমি আপনার নিকট কামগীতা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শুনিয়া আপনি দুর্জ্জয় কামনাকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করুন। আপনি এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, কামনাকে ধর্ম্মের দিকে রাখুন। যে স্বজনবর্গের বিরহে আপনি পুনঃ পুনঃ অভিভূত হইতেছেন, সহস্র শোক অনুতাপ করিলেও তাঁহাদিগের দর্শন পাইবেন না। আমার কথা শুনিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করুন। তাহাহইলে, ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে সদ্গতি হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া, যুধিষ্ঠিরের অহংজ্ঞান দূর হইল। তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগিনী সুভদ্রাকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যান, তখন যুধিষ্ঠির

অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে তাঁহাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের আয়োজন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণসহ পুনরায় হস্তিনায় আগমন করিলেন। যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়া, অর্জ্জুন নানা দেশে ফিরিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে নীলধ্বজ, হংসধ্বজ, বভ্রুবাহন প্রভৃতি অনেক রাজার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। কাহাকেও বিনাশ করিয়া, কাহারও সহিত বা সন্ধি স্থাপন করিয়া, তিনি চতুর্দ্দিক জয়পূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্বসহ হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, মহা সমারোহে যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

যজ্ঞান্তে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিলে, যুধিষ্ঠিরাদি কৃষ্ণ বিরহের কষ্ট ভাবিয়া, অস্থির হইলেন। ভগবান সুমিষ্ট বাক্যে সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ এবং কুন্তীদেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক রথারোহণে দ্বারকায় চলিলেন। পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার এই শেষ দর্শন। ইহার পর তিনি আর হস্তিনায় আসেন নাই, এবং পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও আর তাঁহার দেখা হয় নাই।

যদুবংশ ধ্বংস।

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের পর হস্তিনা হইতে দ্বারকায় আসিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই যদুবংশ ধ্বংস হইল। যদু-বংশীয়েরা অত্যন্ত অশিষ্ট ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই

জন্য ভগবান দূরের দুষ্ট দমন করিয়া, এখন ঘরের দুষ্ট দমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন নারদাদি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্বৃত্ত যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রী সাজাইয়া, মুনিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, এই গর্ভবতী স্ত্রীলোকটীর গর্ভে কি সন্তান হইবে বলিয়া দিন্। ঋষিগণ যাদবদিগের পরিহাসে অসন্তুষ্ট হইয়া, ক্রোধের সহিত অভিসম্পাত করতঃ বলিলেন, যে লৌহ মূষল দ্বারা গর্ভ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই মূষলই প্রসব করিবে এবং তাহাদ্বারা কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন, সমস্ত যদুকুল বিনষ্ট হইবে। ঋষিদিগের অভিসম্পাতে যাদবদিগের মনে ভয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া যাদবদিগকে বলিলেন, তোমাদের দুষ্কার্য্যের অনুরূপ ফল হইবে, ঋষিবাক্য কখনও বৃথা হইবে না। তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া রাজাজ্ঞানুসারে মূষল চূর্ণ করতঃ সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভীত মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা তীর্থ দর্শনের সঙ্কল্প করিয়া, প্রভাসে গমন করিলেন। কৃষ্ণ বলরামও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। প্রভাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। এক দিন সকলে সুরাপানে মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত থাকিয়াও কাহাকে বাধা দিলেন না। সাত্যকি, কৃতবর্ম্মাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, তুমি কাপুরুষের মত নিদ্রিত পাণ্ডবদিগের মস্তক ছেদন করিয়াছ। কৃত-

বর্ম্মা বলিলেন, তুমি যে কাপুরুষেরও অধম, ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়াও আঘাত করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করা তোমার কোন্ পৌরুষের কার্য্য হইয়াছে? সাত্যকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃতবর্ম্মার মস্তক ছেদন করিলেন এবং মত্ততায় অন্যান্যের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃতবর্ম্মার আত্মীয়েরা সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে বিনাশ করিল।

শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই এই সকল কাণ্ড হইতেছে, তিনি কাহা-কেও নিবারণ করিতেছেন না। ক্রমে যাদবগণ এরূপ মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, যিনি যাঁহাকে সুবিধা পাইলেন, তাঁহাকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন; পিতাপুত্রে পর্য্যন্ত সম্পর্ক বোধ রহিল না। অবশেষে সেই মুষলচূর্ণ হইতে উৎপন্ন শরগাছ লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আঘাত আরম্ভ করায় সকলেই বিনষ্ট হইলেন।

এইরূপে যদুবংশ ধ্বংস হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সারথি দারুককে হস্তিনায় অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং দ্বারকায় গমন করিয়া পিতা বসুদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। আর বলিলেন, যাবৎ অর্জ্জুন আসিয়া স্ত্রীগণকে হস্তিনায় লইয়া না যান, তাবৎ আপনি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। অর্জ্জু-নকে আমার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবেন। বলদেব বনমধ্যে যোগাবলম্বন করিয়াছেন, আমিও এখন তথায় যাইব। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া, রমণীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ আর তাঁহাদের স্নেহের বশীভূত হইয়া গৃহে রহিলেন না,—বনে গমন করিলেন।

বনে গিয়া দেখেন, বলদেব যোগে মগ্ন আছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ভগবান, সেই নির্জ্জন বনে এক বৃক্ষতলে শয়ন পূর্ব্বক মহাযোগাশ্রয় করিলেন। এমন সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ, মৃগ ভ্রমে তাঁহার রক্তবর্ণ পদপল্লবে বাণ বিদ্ধ করিল। শেষে নিকটে আসিয়া স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলে, ভগবানের চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কান্দিতে কান্দিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভগবান ব্যাধকে আশ্বাসিত করিয়া, তেজঃ দ্বারা গগনমণ্ডল দীপ্তিঃ ময় করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

এদিকে দারুকের নিকট যদুবংশ বিনাশের সংবাদ পাইয়া, অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি দ্বারকায় রওনা হইলেন। তথায় আসিয়া দেখেন, দ্বারকাপুরী শূন্য, কেবল বিধবা রমণীগণকে লইয়া বসুদেব আর্ত্তনাদ করিতেছেন। এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অর্জ্জুনও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কান্দিতে লাগিলেন। অনন্তর বসুদেব, কৃষ্ণের আদেশবাক্য অর্জ্জুনকে জানাইয়া বালক ও রমণী গণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণপূর্ব্বক যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিলেন। দৈবকী ও রোহিণী স্বামীর চিতারোহণ করতঃ দেহ বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বর্গে গিয়া, কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা রমণীগণের মধ্যে, কেহ প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া, কেহ বা যোগাবলম্বন করিয়া, প্রাণত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন। অবশিষ্ট কৃষ্ণ-রমণীদিগকে লইয়া শোকাতুর অর্জ্জুন হস্তিনাভিমুখে রওনা হইলেন। পথি-

মধ্য হইতে দস্যুগণ তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। নিয়তির ফল প্রতিরোধে মহাবীর অর্জ্জুন সমর্থ হইলেন না।

অর্জ্জুন কাতর প্রাণে শূন্য হৃদয়ে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সমস্ত সমাচার শুনিয়া, ভূতলশায়ী হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, রাজত্ব করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। তাঁহাকে বুঝাইয়া সংসারে রাখিতে এখন কেহ নাই। কৃষ্ণ ছিলেন, তিনি গিয়াছেন, সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে কেহ রাখিতে পারিলেন না। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ হিমালয়ের দিকে মহাপ্রস্থান করিলেন।

এখন যাদব ও পাণ্ডব উভয় কুলের অবস্থা সমান হইল। যদুবংশে রহিলেন, কৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধতনয় বালক বজ্র এবং পাণ্ডুর বংশে রহিলেন, অর্জ্জুনের পৌত্র বালক পরীক্ষিত। মহা প্রস্থান কালে পাণ্ডবেরা মাতামহালয় হইতে বজ্রকে আনাইলেন এবং তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে ও পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইয়া রাজত্ব ছাড়িলেন। এই পরীক্ষিতের জন্য, আমরা মহাভারত, আর বজ্রের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মূর্ত্তি গোবিন্দজী বিগ্রহ দেখিতে পাই।*

---

* প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি গঠনে অভিলাষী হইয়া বজ্র, মাতা উষার নিকট তাঁহার আকৃতির বর্ণনা শুনিয়া ভাস্কর দ্বারা প্রথমে একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করান। মূর্ত্তি কেমন হইয়াছে, উষাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, চরণ দুই খানি ব্যতিত আর কোন অঙ্গ ঠিক্ হয় নাই। তিনি পুনরায় এক বিগ্রহ

উপসংহার।

দয়াময়! তুমি তোমার মানব-সন্তানদিগকে দয়া করিয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিতে আসিয়া, একশত পঁচিশ বৎসরের পর মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করিলে, কিন্তু আমরা কি শিখিলাম? —বসুদেব ও দৈবকী, রাজা কংসের অমানুষিক অত্যাচারে নিপীড়িত; পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া, নিরাশ মনে দিনরাত্রি কান্দিয়াছেন, আর কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য পুত্র হইয়া জন্ম লইলে; তাঁহাদের পুত্র শোক নিবারণ করিলে, বিপদ দূর করিলে। তোমার কার্য্য দেখিয়া জগৎ বুঝিল, পৃথিবীর রাজার অত্যাচার হইতেও বিশ্বের রাজা রক্ষা করেন। তুমি অসহায়ের সহায়, অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; যাহার কেহ নাই, তাহার তুমি আছ। তুমি জগৎকে শিক্ষা দিলে, তোমার রাজ্যে অসহায় কেহ নহে।

তুমি বসুদেব ও দৈবকীর বিপদভঞ্জন করিতে মথুরায় জন্ম

প্রস্তুত করাইলে, উষা দেখিয়া বলিলেন, এবার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ঠিক্ হইয়াছে। অবশেষে বিশেষরূপে শুনিয়া তৃতীয়বার একটী বিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন। এবারের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আকৃতির সহিত এরূপ ঐক্য হইয়াছিল যে, উষা দেখিতে আসিয়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন জ্ঞানে লজ্জায় অবগুণ্ঠনদ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিলেন। এই মূর্ত্তি এখন জয়পুরের মহারাজার পুরীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

গ্রহণ করিলে, কিন্তু ভক্ত নন্দ ও যশোদাকে চরিতার্থ করিতে গোকুলে আশ্রয় লইয়া, তাঁহাদিগকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে।

দয়াময়! তুমি জগতের পিতামাতা, কিন্তু কৃতঘ্ন মানব-সন্তান দিগের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার সৌভাগ্য তোমার কমই ঘটে। তুমি কিন্তু নন্দযশোদাকে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিলে না। স্নেহ যত্নের জন্য, তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছ; সন্তানের প্রতি মাতার যতদূর আধিপত্য চলে, মা যশোদাকে তাহা করিতে দিয়াছ। ইচ্ছা করিয়াই যেন, তাঁহার হাতে বন্দি হইয়াছ, প্রহার খাইয়াছ। আশ্চর্য্য এই যে, তুমি জগৎ পিতা হইয়া মাতার যে শাসনে বিরূপ ভাব নাই, তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, তোমার মানব-সন্তানেরা কিন্তু তাহাতে বিরূপ ভাবে। আহা যে, মাতার নিকট প্রহার খায় নাই, মাতৃ-স্নেহের এক অঙ্গ বুঝিতে তাহার বাকি আছে। মাতার প্রহার অপূর্ব্ব জিনীস। স্নেহের হাতের সেই প্রহারে পৃষ্ঠে দাগ বসে না; মাতার প্রহারের ন্যায় বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া আর নাই; মারিয়া অনুতাপ করিতে ও কান্দিতে মা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। হায়, বাল্যকালে তাহার মর্ম্ম বুঝি নাই, কিন্তু সে প্রহারের কথা মনে হইলে, এখন হাসি পায়। সেই প্রহারের কোমলত্ব ও মধুরত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, এখন যদি মা দয়া করিয়া মারেন, তাহাহইলে বোধ হয় চরিতার্থ হই। যাহাহউক বুঝিয়াছি, তোমাকে বন্ধন করিতে, মা যশোদার হাতে দড়ি কুলায় নাই কেন। অন্যের হাতে হইলে,—

কষিয়া বাঁধিতে পারিলে বোধ হয় কুলাইত। তুমি ভক্তকে সকল অধিকারই ভোগ করিতে দিয়াছ।

নন্দ ও যশোদাকে পিতা মাতা বলিয়া তুমি ভক্তের মনের সাধ মিটাইয়াছ। জগৎ বুঝিল, ভক্ত তোমাকে যে ভাবে চায়, তুমি সেই ভাবে তাহার বাসনা পূর্ণ কর। ভক্তের জন্য, তুমি সকলই করিতে পার, নন্দের বাধা বহন করিয়াছ,—ধেনু চরাইয়াছ।

তার পর পুতনা বধ।—পূতনা রাক্ষসী। মাতৃবক্ষে পয়োধর অমৃতের ভাণ্ড, উহা তোমার মূর্ত্তিমতী দয়া। তুমি যে অপূর্ব্ব কৌশলে উহাতে দুগ্ধের সঞ্চার রাখিয়া জীবের প্রথম খাদ্যের সংস্থান করিয়াছ, তাহা ভাবিলে, জীবের প্রতি তোমার অসীম দয়া স্মরণ করিয়া, কোন্ পাষণ্ড চক্ষের জল রক্ষা করিতে পারে? পুতনা তোমার সৃষ্ট সেই অমৃতের আধারে বিষের প্রলেপ দিয়া, তোমাকেই বধ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতেই বুঝিয়াছি, পুতনা নিশ্চয় রাক্ষসী। তুমি শিশু মূর্ত্তিতে পুতনা বধ করিলে; জগৎ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন হইতে তোমার কার্য্য কলাপের দিকে সকলের লক্ষ্য পড়িল, তোমার দিকে সকলের মন আকৃষ্ট হইল। ভাবিল, তুমি যে সে নও। মানুষ বড় অভিমানী; সহস্র জ্ঞানী হইলেও মানুষের উপদেশ মানুস সহজে শুনিতে চায় না। কিন্তু একটু অলৌকিকত্ব দেখিলেই অমনি মস্তক নত করে। সুতরাং কার্য্য ও উপদেশ দ্বারা তুমি যেসকল শিক্ষা দিলে, তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, প্রথম হইতেই লোকে তাহাতে মনোযোগ করিল। কালিয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ

অন্তে মোক্ষফল লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিলাম, প্রেম ভক্তিই মনুষ্য-জীবনের চরম সৌভাগ্য দান করে।

গোপীগণ কান্ত ভাবে তোমার ভজনা করিয়াছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন, এই কান্ত-ভাব তোমার ভজনার শ্রেষ্ঠ উপায়। হিন্দুরমণীর পতিই সর্ব্বস্ব, পতি সেবাই তাহাদের চরম সেবা। পতি ভক্তি পতি প্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রেমভক্তি কি আছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা স্বামীর জন্য হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিতে পারে, জলন্ত চিতায় দগ্ধ হইতে পারে; পতি বিরহ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর। পতির মৃত্যুতে তাহারা যে ভাবে অবস্থিতি করে, সে দৃশ্য জগতে আর কোথাও নাই। তাই বুঝিয়াছি, কান্ত ভাবে তোমার ভজনা করা, গোপাঙ্গনাদিগের পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ভাব নারী ভিন্ন অপরে, হৃদয়ে আনিতে পারিবে কি না, তাহা বুঝিতে পারি নাই। —পারে ভাল; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, তোমার সাধনার জন্য ভাবের অভাব নাই; অভাব কেবল প্রেমভক্তির। প্রেমভক্তি থাকিলে, সকল ভাবেই তুমি অনুগ্রহ কর। প্রেমভক্তি শিক্ষার অনেক আদর্শ সংসারে রাখিয়াছ। পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, প্রাণের সুহৃদ—এ সকলই শিক্ষার আদর্শ। তুমি বিশ্বের রাজা, জগতের পিতা, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, জগদ্বন্ধু, তোমার সহিত সম্পর্কের অভাব কি? যা বলিব তুমি তাই; যে সম্পর্কে সুবিধা পাইব, তাহাই ধরিয়া তোমার প্রতি প্রেমভক্তি প্রকাশ করিব। সাধক কবির এই গান টুকু বড় মনে লাগে,—

"তুমি কারো পিতা কারো মাতা কারো সুহৃদ্ সখা হও,
প্রেমে গলে, যে যা বলে, তাতেই তুমি প্রীত রও।"

মূল কথা, অটল বিশ্বাস, আর প্রেমভক্তি চাই। স্থির বিশ্বাস এবং প্রেমভক্তির বলে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সাধক রামপ্রসাদ মা ডাকিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ যে, অশীতিপর-বৃদ্ধা গলবস্ত্র হইয়া, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে কপাল ঠুকিতেছেন, আর বলিতেছেন "ঠাকুর রক্ষা কর।" যাঁহার জ্ঞানের চক্ষে উহা কুসংস্কার বলিয়া বোধ হইবে, বিনয় করিয়া বলি, উঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানের আবশ্যক নাই, উনি যদি ভুলিয়া থাকেন, সে ভুল ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই। উঁহার ঐ অমূল্য বিশ্বাস, অসীম ভক্তিতেই কাজ হইবে। দীননাথ! তুমি গীতায় বলিয়াছ, "আমি ভাবগ্রাহী, আমি অন্তর্যামী, আমি সর্ব্বভূতময়, আমি বিশ্বব্যাপী, আমার সহিত অভেদ জ্ঞানে, যে, যে দেবতার পূজা করে, সকলই আমার গ্রাহ্য।' তাহা হইলে ঐ বৃদ্ধার পূজা অগ্রাহ্য হইবে কেন? হরিহরে অভিন্নদেহ সদাশিব আশুতোষ ভোলানাথ মহেশ্বরের যিনি পূজা করেন, তিনি তোমারই পূজা করেন। তুমিই বিশ্বজননী রূপে ভগবতী।* তুমি গীতায়

---

* জগন্মাতার বরাভয় মূর্ত্তি দেখিলে, সন্তানের মনে কত আশা জন্মে। বিশ্ব জননীর পূজা করিতে বা প্রাণভরা মা ডাক ডাকিতে ভারতবাসী ভিন্ন আর কোন দেশের লোকে জানে না। মা ভিন্ন সন্তানের বেদনা কে বুঝে? প্রাণের ব্যথা মাকে না জানাইলে কি শান্তি হয়? জানাইতে মুখেও কিছুমাত্র বাধে না। মূল শক্তিরূপী ভগবানকে মা না ডাকিলে কি তৃপ্তি হয়?

যাহা বলিয়াছ, তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছি, কিন্তু মানুষ ভেদ জ্ঞান করিয়া পূজা নষ্ট করে কেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তোমার গীতার মর্ম্ম লইয়া, ভক্ত কবি বিষ্ণুরাম গাইয়াছেন,—

" প্রেম ক'রে যে যা বলে, প্রেম-সিন্ধু সেই তোমার নাম,
শ্যাম বলুক, শ্যামা বলুক, অথবা বলুক শিব রাম;
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবেনা আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি, তোমার কাছে নাই জাত বিচার।"

আবার গাইয়াছেন,—

"প্রেমে যদি পাষাণ পূজে, প্রেমে যদি শ্মশান ভজে,
যার প্রেম সে লবে বুঝে, সে কি পাষাণ শ্মশান গণে?"

যাহাহউক বুঝিলাম, তুমি ভাবগ্রাহী, অন্তরের প্রেমভক্তিই তুমি গ্রহণ কর।

গোপীরা এই প্রেমভক্তির জোরে তোমার ভুবনমোহন রূপ অন্তরে দেখিয়াছেন এবং বাহিরে দেখিয়াছেন। এমন সৌভাগ্য মহা মহা যোগীদিগেরও হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাভক্তি শূন্য অপ্রেমিক ভাগ্যহীন ব্যক্তিরা, তোমাকে তোমার লীলার সময়ে চক্ষের সম্মুখে পাইয়াও চিনিতে পারে নাই। তাহাতেই বুঝিয়াছি, তুমি ভক্ত ভিন্ন ধরা দাও না। তুমি জগৎ কারণ, তোমাকে দেখিতে সকলেই বাঞ্ছা করে, না দেখিয়াই মন ভোলে, যাহারা দেখিয়াও দেখে নাই তাহাদের কি কম দুর্ভাগ্য?

গোপীদিগের অসীম সৌভাগ্য সহজ জ্ঞানেই জন্মিয়াছিল। তাই মনে হয়, তুমি যেমন সকলের আরাধ্য, তেমনি সহজ

জ্ঞানেই সকলের বোধ্য। তুমি সহজ জ্ঞানে ধরা না দিলে, মানবের সাধ্য কি যে, জ্ঞানযোগে তোমাকে ধরিবে? যিনি জ্ঞানে ধরিতে গিয়াছেন, তিনিই শেষে অনন্ত বলিয়া তোমার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দিগ্দর্শনের কাঁটা যেমন সর্ব্বদা উত্তর মুখে অবস্থিতি করে, মানবের মন সহজ ভাবেই তেমনি তোমার দিকে থাকে। তুমি দয়া করিয়াই মানব মনের এই স্বাভাবিক গতি রাখিয়াছ। তাই ভাবি, এই সহজ জ্ঞান, অটল বিশ্বাস, আর অসীম প্রেমভক্তির বলেই গোপীগণ তোমাকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মের যে সুকৃতি ছিল, তাহাও বোধ হয় এই সহজজ্ঞান-জাত। তোমার এই লীলাতে জ্ঞান অপেক্ষাও প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিলাম।*

---

* রূপ গোস্বামীকে প্রেমতত্ত্ব বুঝাইতে প্রেমময় চৈতন্য দেব যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

কর্ম্মানুষ্ঠানই কর, আর জ্ঞানানুশীলনই কর, কোন না কোন সময়ে, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানবমনে উদয় হইয়া, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবেই জন্মিবে। তখনই বুঝিবে মনে ভক্তির সূত্রপাত হইল। এই সুযোগের সময়ে, মানব যদি নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, উপযুক্ত গুরূপদেশের আশ্রয় লয় এবং গুরুর নির্দ্দেশ ক্রমে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাহইলে, ঐ ভক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া ঈশ্বরানুরক্তি বৃদ্ধি করে। ভগবান তখন অকিঞ্চনের চেষ্টা সফল করিতে, অন্য ভক্তসাধুর সহিত তাহার মিলন করিয়া দেন এবং তাহাকে প্রেমানন্দের আস্বাদ অনুভব করান। প্রেমানন্দের

তাহার পর কংসজরাসন্ধাদির বধ। এই দুরাত্মারা তোমার প্রদত্ত জীবন লাভ করিয়া তাহার অপব্যবহার করিয়াছে। পরের উপকার ও জগতের মঙ্গলের জন্য, তুমি যে শক্তি সামর্থ্য দিয়াছিলে, তদ্বারা পরের পীড়ন করিয়াছে, পৃথিবীর অনিষ্টসাধন করিয়াছে। তোমার রাজ্যে বাস করিয়া, তোমার প্রদত্ত জীবন লইয়া, তোমারই বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে। তুমি যে সর্ব্বোপরি শাসনকর্ত্তা, সে কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।

ইহাদের পাপাচরণে পৃথিবীর যেমন অমঙ্গল হইয়াছে, পাপ ভার গুরুতর হইয়া ইহাদের পরকালের দুর্গতিও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। দয়াময়! ইহারাই যেন কু-সন্তান, তুমি ত আর কু-পিতা নও। তাই তুমি ইহাদিগকে সংসারে না রাখিয়া, আবার পোড়াইয়া খাঁটি করিবার জন্য তুলিয়া লইয়াছ। তাহাতে পাপীর ও পৃথিবীর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হইয়াছে। তুমি যে পতিত পাবন, এবং মঙ্গলময় ও তোমার প্রত্যেক ঘটনা যে মঙ্গল সূচক, এতদ্বারা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

আস্বাদ পাইলে, কোন প্রকার সাংসারিক সুখ আর তাহার কাছে ভাল লাগে না। দ্বেষহিংসাদি প্রেমের বিরোধী অসৎ বৃত্তি সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ক্রমে সংসারের সুখাসক্তি একেবারে ছাড়িয়া কৃষ্ণ-চরণ সার করিতে পারে, ভগবান, প্রেমের চরম ফল দানে তাহাকে চরিতার্থ করেন। চতুর্ব্বর্গ ফল, এই ফলের নিকট অকিঞ্চিৎকর।

সাধন ভক্তি হইতে ভগবানের প্রতি রতি জন্মে। ঐ রতি গাঢ় হইলেই তাহাকে প্রেম বলে। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ,

তাহার পর কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ।—পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের কার্য্য স্মরণ করিলে ঘৃণা জন্মে, দ্রৌপদীর অবস্থা ভাবিলে বুক ফাটে, পাণ্ডবদিগের দুর্গতির কথা মনে হইলে, চক্ষে জল আসে। তুমি জগৎ পিতা, তোমার একটী সন্তান বুদ্ধির দোষে মাঠে মারা গেলে, তোমারই লাগে। দুর্য্যোধনের পাপাচরণ কংসাদির স্থায় সীমা অতিক্রম করে নাই। তাই প্রথমে বাপু বাছা করিয়া কত বুঝাইলে, দুর্য্যোধন তাহা শুনিল না। শেষে যাহা করিবার তাহাই করিলে; অধর্ম্মের পতন, ধর্ম্মের জয় দেখাইলে।

আহা, এই অসার সংসারে আসিয়া মানুষের কত সাধই যায়। নির্লজ্জ পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন, কুরুসভামধ্যে পাণ্ডবদিগের সাক্ষাতে, স্বীয় উরুদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক তথায় পাণ্ডব গৃহিণী দ্রৌপদীকে বসিতে বলিয়াছিল। অন্তিমকালে সেই উরুভঙ্গ হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িল। নিজের বিপুলরাজ্যে দুরাত্মার আশা মেটে নাই, তাই অতি লোভে পাণ্ডবদিগের রাজ্য গ্রাস করিল; তাঁহাদিগকে সূচাগ্র ভূমি দিতেও সম্মত হইল না। আহা,

---

অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এই সকল, প্রেমের ক্রমোৎকর্ষতায় উৎপন্ন হয়।

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিলে, জড় পদার্থে আর মনের প্রীতি থাকে না। অর্থাৎ ভোগ্যপদার্থে মানবের যে প্রীতি ছিল, তাহা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। ভগবানের প্রতি প্রীতির প্রথমাবস্থাকেই ভাব কহে। ভাবের উদয় হইলে, প্রাকৃতদুঃখ জন্য মনে ক্ষোভের উদয় হয় না। তখন মানব ভগবানের প্রসঙ্গ লইয়া কালযাপন করিতে ভালবাসে। এই সময়ে ইন্দ্রিয় সুখে আর

অন্তিম কালে দেখি, তাহার নিশ্বাস টুকু ফেলিবার স্থান নাই,—সে দর্প নাই, সে অহঙ্কার নাই, সে মত্ততা নাই, সে লোভ নাই—তখন "রাজ সিংহাসন, ছাই মাটী বন" সকলই তাহার পক্ষে সমান দেখিলাম। দুর্য্যোধনের কার্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, সংসার ভোগের জন্য তুমি বুঝি তাহাকে কায়েমী পাট্টা দিয়াছ,—তা নয়? তবে হলো কি? যদি বিপুল রাজত্ব, অতুল আধিপত্য, চির ভোগেই না আসিল, অন্তিম কালে কিছু সঙ্গেই না গেল, তাহাহইলে ত বিষয়ের মত্ততাতেই দুর্য্যোধনের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইল, বিষয়ের লোভই ত তাহাকে এই ভবসাগরে ডুবাইল! তুমি ভবের ধন ভবেই বিলাও, কেহ তাহার একতিল সঙ্গে লইতে পারে না। বুঝিলাম, ধন, জন, বিষয়, বিভব কিছুই অন্তিমের সাথী নহে, অন্তিমের সাথী কেবল ধর্ম্ম। ধর্ম্মই নিদানের বন্ধু, ধর্ম্মই শেষের সম্বল, ধর্ম্ম থাকিলেই তোমার চরণ মেলে। ধর্ম্মের বলেই পাণ্ডুদিগের শেষরক্ষা হইল এবং তাঁহারা অলৌকিকভাবে স্বর্গারোহণে সমর্থ হইলেন। অতএব বুঝিলাম,

---

বাসনা থাকে না। ভাবের আধিক্য হইলে, মানব আপনাকে অত্যন্ত হীন মনে করে এবং হীনকে তিনি কৃপা করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উৎসুক-চিত্তে নিরন্তর ভগবানের নাম করে,—গুণ ব্যাখ্যা করে। তখন আর সংসারাশ্রমে প্রবৃত্তি থাকে না। এই অবস্থায় মানব, ভগবানের নাম সম্বল পূর্ব্বক সংসার ছাড়িয়া তীর্থবাসী হয়। নাম নিষ্ঠায় মনস্থির রাখিয়া ক্রমে প্রেমভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে, শেষে পরমাগতি লাভ করে।

ধর্ম্ম ভিন্ন,—তুমি ভিন্ন, এ জগতের উপরে ও নীচে যাহা দেখি, সকলই মিছে,—সকলই অসার।

কিন্তু দীনবন্ধু! তোমার কৌশল বলিহারী যাই। সংসারকে অসার জানিয়া সকলেই যদি ইহাতে অনাসক্ত থাকে, তাহাহইলে ত তোমার সৃষ্টি রক্ষা হয় না। তাই বুঝি, মানবহৃদয়ে প্রবৃত্তি দিয়া, মানুষকে সংসারাসক্ত রাখিয়াছ। আহা, অসীম অপত্য-স্নেহ, আশ্চর্য্য দাম্পত্য সুখ, মনোমুগ্ধকর প্রিয়সম্মিলন প্রভৃতি দ্বারা এবং জীবন ধারণের জন্য দারুণ জঠরানল দ্বারা, তুমি মানুষকে এরূপ আবদ্ধ রাখিয়াছ যে, কাহার সাধ্য সহজে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে? মানুষ অসার সংসারের সুখ পাইয়া ভুলিয়া রহিয়াছে। তাই সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চিন্তা, কম লোকেই করিতে পারে। কিন্তু যিনি পারিয়াছেন,—যিনি ঐ আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তোমার চরণ সার করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, তোমার চতুরতাকে ধন্য। এরূপ না করিলে, তোমার চরণ বাঁচান ভার হইত,—সৃষ্টি রক্ষা কঠিন হইত। পাণ্ডবেরা মহামারী ব্যাপার করিয়া রাজত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু তোমার বিরহে সে রাজত্ব আর তাঁহাদের ভাল লাগিল না। সেই জন্য, সকল ছাড়িয়া, শেষে মহাপ্রস্থানকরিলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ উপলক্ষে, তুমি যে দর্পহারী, পতিত-পাবন, ভক্তবৎসল, বিপদের বন্ধু, অগতির গতি, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঙ্গালের সখা, এই সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। আর অর্জ্জুনকে বুঝাইবার উপলক্ষে তুমি যে সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়াছ, তাহা শুনিয়া চরিতার্থ হইয়াছি।

তাহার পর যদুবংশ ধ্বংস।—তুমি জগৎ পিতা, আমরা সকলেই তোমার সন্তান, কিন্তু তোমার মর্ত্ত্য-লীলায়, লোকে তোমার একটী পৃথক বংশ দেখিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তোমার যদুবংশও যা, আমরাও তাই। তোমার যদুবংশ বড় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তুমি দূরের দুষ্ট দমন করিয়া পৃথিবীকে নিরাপদ করিলে, শেষে ঘরের দুষ্ট দমনে প্রবৃত্ত হইলে। বিচার, অপরের বেলাও যাহা করিয়াছ, তাহাদের সম্বন্ধেও তাহাই করিলে। তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া, শেষে বৈকুণ্ঠে গেলে। তুমি নির্লিপ্ত পুরুষ, তাই তাহাতে তোমার একটু মায়া বা মমতা দেখিলাম না। দর্প অহঙ্কার চূর্ণ করিবার সময় তুমি কাহাকেও ছাড় নাই। তুমি ধর্ম্ম অবতার, তোমার বিচারে কি পক্ষপাত হইতে পারে?

দয়াময়! তোমার লীলা সম্বন্ধে যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ দুই চারি কথা প্রকাশ করিলাম। আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির ইহাতে হাত দেওয়া উচিত ছিল না। দোষ ত্রুটি অনেক ঘটিয়াছে। তবে ভরসা তোমার দয়া। মানুষ যাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে, তুমি দয়া করিয়া তাহাকে কোলে কর। সেই ভরসায় এই অধম আতুর সন্তান, তোমার পাদ পদ্মে শত সহস্র প্রণাম করিয়া যোড়করে প্রার্থনা করিতেছে,—

"যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দন।"

সম্পূর্ণ।